গীতানুশীলন।

প্রথম খণ্ড

ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক,

শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী, বি এ, প্রণীত।

মূল্য আট আনা।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবান গুরুদেবের

শ্রীচরণারবিন্দে উৎসর্গীকৃত—

প্রভো !

তোমার কৃপায় যাহাকে জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে লাভ করিয়া ৪৩ বৎসর কাল সংসার-সুখ ভোগ করিয়াছিলাম, ১৩৪৪ সনের ২৮শে ফাল্গুন কালরাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে, সে আমার হৃদয় শূন্য করিয়া তোমারই নিকট চলিয়া গিয়াছে ! তাহার বড় সাধ ছিল, আমার লিখিত গীতার ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবে ; সেজন্যই আমি গীতানুশীলন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু দেব ! তোমার ইচ্ছায় তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই ! আত্মা সর্ব্বগত বলিয়া অপরে ইহা পাঠ করিলেও তাহার আনন্দ হইতে পারে এই আশায় গীতানুশীলনের কিয়দংশ আপাততঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল। আমার সেই প্রাণপ্রতিম তনয় ৺সুবোধবিহারীর পরিতৃপ্তি-কামনায় এই গ্রন্থ অভাগার অশ্রুসিক্ত অর্ঘ্যরূপে তোমার শ্রীপাদপদ্মে অর্পিত হইল। কৃপাপূর্ব্বক তাহার শান্তিবিধান করিও ।

১১ই আশ্বিন,
১৩৪৫ সন।

শ্রীচরণাশ্রিত—
হতভাগ্য গ্রন্থকার।

নিবেদন।

গীতার বহুপ্রকার সংস্করণই বাহির হইয়াছে, এবং এদেশে ঘরে ঘরেই তাহার ২।১ খানি গ্রন্থও বিদ্যমান আছে। এ অবস্থায় আমি এই গীতানুশীলন-প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি কেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিবেদন করা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

গীতা পাঠ করিয়া আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম; প্রায় এক বৎসর যাবৎ সেই লেখা "ঢাকাপ্রকাশ" পত্রে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইতেছে। সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেশের অনেক মনীষী পণ্ডিত আমাকে কৃপাপূর্ব্বক, জানাইয়াছেন যে, গীতানুশীলনপাঠে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন; কারণ ইহাতে এমন অনেক অভিনব তত্ত্ব আছে, যাহা ইতি-পূর্ব্বে আলোচিত হয় নাই। এই কারণে তাঁহারা প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত অনুসারে কার্য্য করা সমীচীন হইবে কিনা, তাহা আমি চিন্তা করিতেছিলাম; এই সময় আমার পরম সুহৃদ্ অবসরপ্রাপ্ত জিলা-জজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রচার করার জন্য অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করায়, গীতানুশীলনের মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই পুস্তক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের প্রীতিজনক হইবে কিনা, তাহা বুঝিবার জন্য গীতানুশীলনের কিয়দংশ প্রথমখণ্ডরূপে আপাততঃ প্রকাশিত হইল। দেশবাসী যদি এই পুস্তকের অবশিষ্ট

প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রকাশের প্রয়োজন অনুভব করেন, তবে তাহাও যথাসময়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করা যাইবে। দুরদৃষ্টবশতঃ জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালমৃত্যুজনিত মর্ম্মবেদনার ফলে, আমার বিশেষ স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে; কাজেই গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও প্রুফ্‌- সংশোধন আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সুতরাং এই পুস্তকের ভ্রম-প্রমাদাদির জন্য আমি পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ঢাকাপ্রকাশের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভৌমিক, বি কম্‌, মহাশয় বিশেষ যত্ন ও শ্রম সহকারে এই পুস্তকের প্রুফ্‌ দেখিয়া না দিলে এত অল্প সময়ে ইহা প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না; এজন্য তিনি আমার ঐকান্তিক ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। এই পুস্তক-পাঠে দেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দ যদি কোনরূপ উপকৃত হ'ন, তবেই ইহার প্রকাশ সার্থক হইবে। ইতি—

নিবেদক—গ্রন্থকার।

গীতানুশীলন

মহাভারতে গীতা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে; ইহা শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবিরচিত মহাভারত নামক মহাগ্রন্থের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় পর্য্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায় মধ্যে নিবদ্ধ আছে। সুতরাং মহাভারতের আখ্যায়িকার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহার অর্থবোধ করাই যে সর্ব্বথা সমীচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গীতাকে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ মনে করিলেও যে ইহার অর্থবোধে ব্যাঘাত ঘটে, অথবা ইহাতে নিহিত গভীর তত্ত্বসমূহের গৌরবের হানি হয়, তাহা নহে; কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত বিবরণের সাহায্যেই ইহার অর্থ সমধিক পরিস্ফুট হইয়া থাকে। যে প্রসঙ্গে ও যে স্থানে গীতার অবতারণা হইয়াছে, তাহা উপন্যাসের ন্যায় কল্পিত কাহিনী মনে করিলে, মহাভারতে গীতার সন্নিবেশ কেবল নিরর্থকই হয় না, অধিকন্তু অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষপ্রধানের চরিত্রেও অযথা দুরপণেয় কলঙ্ক আরোপিত হইয়া থাকে।

মহাভারতে বর্ণিত আছে, কৌরবপতি সম্রাট বিচিত্রবীর্য্য পরলোকগমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া

সিংহাসন লাভ করিতে পারেন নাই, কনিষ্ঠ পাণ্ডুই সম্রাট-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর পাণ্ডু মুনির শাপে কালকবলে নিপতিত হওয়াতে, তাঁহার যুধিষ্ঠিরাদি অপ্রাপ্তবয়স্ক পঞ্চপুত্রের প্রতিনিধিরূপে ধৃতরাষ্ট্র সাময়িকভাবে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সেই সুযোগে ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্য্যোধন সাম্রাজ্য হস্তগত করিবার নিমিত্ত পাণ্ডুপুত্রগণের নিধনসাধনার্থ বহুপ্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন চক্রান্তই সফল হয় নাই। কাযেই ধৃতরাষ্ট্র অতঃপর পাণ্ডবগণকে সাম্রাজ্যের কিয়দংশ প্রদান করিতে বাধ্য হ'ন, এবং যুধিষ্ঠিরও নরপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন উহাতে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পাণ্ডবগণের উচ্ছেদসাধনকল্পে অবশেষে স্বকীয় কুচক্রী মাতুল শকুনির সাহায্যে যুধিষ্ঠিরকে কপট পাশাখেলায় পরাজিত করিয়া, পাণ্ডবগণকে চতুর্দ্দশ বৎসর কাল বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের নিয়মে বনবাসে যাইতে বাধ্য করেন। যুধিষ্ঠির ঐরূপে কপট পাশার প্রভাবে পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, দুর্য্যোধনের ইঙ্গিতে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুঃশাসন যখন পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী দেবীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহার বস্ত্রহরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন সেই অত্যাচার ও অবমাননা অসহনীয় হওয়াতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাণ্ডব বীরাগ্রগণ্য ভীম ও অর্জ্জুন কৌরবগণের উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত কৃতসংকল্প ও ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তার পর,

বনবাসকালে অর্জ্জুন সেই প্রতিজ্ঞাপালনার্থ শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে মহাদেব ও দেবরাজ ইন্দ্রের তৃপ্তিসাধন করিয়া পাশুপতাদি নানাবিধ দিব্যাস্ত্র লাভ করেন।

বনবাস ও অজ্ঞাতবাসের কাল অতীত হইলে, অর্জ্জুন সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বহু রাজন্যবর্গের সাহায্যে কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে গমনপূর্ব্বক মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবপতি দুর্য্যোধনও রাজশক্তির বলে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ও অধিক সংখ্যক নরপতিগণকে নিয়া কুরুক্ষেত্রে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রমুখ বিশ্ববিজয়ী বীরবর্গের সহায়তায় বিজয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু কৌরবপক্ষের এইরূপ বলাধিক্যেও অর্জ্জুন ভীত বা সন্ত্রস্ত হ'ন নাই; স্বকীয় শৌর্য্যবীর্য্যের প্রভাবে বিজয়লাভ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াই তিনি কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি ভীষ্মদেব যখন শঙ্খধ্বনি করিয়া যুদ্ধঘোষণা করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সহ নিজেও শঙ্খধ্বনি করিয়া সানন্দে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে যুদ্ধারম্ভ সূচিত হইলে, অর্জ্জুন স্বকীয় গাণ্ডীবধনু উত্তোলন করিয়া শরবর্ষণে উদ্যত হইয়াছিলেন (প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ); তখন সম্ভবতঃ আত্মগৌরবের উন্মাদনায় বিপক্ষের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াই তিনি তাহার রথ উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে লইয়া যাওয়ার জন্য সারথি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিয়া কহিলেন,—দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের হিতকামনায় যেসকল ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে ভালরূপে দেখিয়া

নিয়া, কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত তিনি নিজে যুদ্ধ করিবেন, যে পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় না করেন, ততক্ষণ রথ তথায় রাখিতে হইবে। এরূপ বলার অভিপ্রায় এই, যে সকল রাজা বা বীর দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে সাহায্য করিতে আসিয়াছে, তাহারা কে কোথায় অবস্থিত আছে তাহা নির্ণয় করিয়া, তিনি স্বহস্তে তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি ক্রোধের উদ্রেক হওয়াতেই যে অর্জ্জুন রথ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থানে নিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহার কথা হইতেই সে বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে।

"যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥

ক্রোধে অধীর হইয়া যে অর্জ্জুন অকস্মাৎ এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, সে কথা সহজবোধ্য ; নচেৎ যে সারথিপ্রবরের সহায়তা লাভ করিয়া তিনি নিজকে কৃতকৃত্য মনে করিতেন, এবং যাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা সম্বন্ধে তাঁহার কোনই সন্দেহ ছিল না, তাঁহার উপদেশ না নিয়া তিনি কখনই এরূপ ঔদ্ধত্যপ্রকাশে প্রণোদিত হইতেন না। যুদ্ধকালে সহসা বিপক্ষের সম্মুখীন হওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদও নহে ; কিন্তু ক্রোধের বশে ও আত্মশক্তির অভিমানে সে সময় অর্জ্জুন ইহা ভাবিবারও অবকাশ পা'ন নাই। সেকালে অর্জ্জুনের সমকক্ষ বীর আর কেহ ছিল না ; এই কারণে তিনি অপর সকলকেই উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধারম্ভের

প্রাক্‌কালে মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, কৌরবগণের বিরাট বাহিনী তিনি একদিনেই ধ্বংস করিতে পারিবেন! অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধ করিয়াও অর্জ্জুন যে বাহিনীর সম্পূর্ণ বিলোপসাধনে সমর্থ হ'ন নাই, একদিনে তাহা ধ্বংস করার প্রতিশ্রুতিপ্রদান অপেক্ষা অধিকতর প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক আর কি হইতে পারে! মহাপ্রস্থানের পথে অর্জ্জুন নিপতিত হইলে, ভীমসেনের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, এইরূপ আত্মাভিমানই তাঁহার পতনের কারণ। এসকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয়, স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ অহমিকতাবশে ক্রোধোন্মত্ত হইয়াই অর্জ্জুন উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে তাঁহার রথ লইয়া যাওয়ার জন্য সারথিকে আদেশ করিয়াছিলেন।

অর্জ্জুনের অবসাদ।

শ্রীকৃষ্ণ যে অচ্যুত পরমপুরুষ তাহা জানিয়াও অর্জ্জুন এইরূপ আত্মশ্লাঘাপ্রকাশে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই (সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত); কাযেই সেই জ্ঞানকৃত অপরাধের ফল তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গেই ভোগ করিতে হইয়াছিল। এইমাত্র যিনি শত্রুদলনের গর্ব্বে উন্মত্ত

হইয়া উঠিয়াছিলেন, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতেই তাঁহার সেই মনোভাব অত্যদ্ভুতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং যাহাদের শিরশ্ছেদ করিবার নিমিত্ত তিনি ধনুর্ব্বাণ উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই রক্ষা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধবিমুখ তো হইলেনই, অধিকন্তু তাহাদের কল্যাণকল্পে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হইলেন! পলকে প্রলয়ের ন্যায় অর্জ্জুনের এই অত্যদ্ভুত আচরণেই গীতার সার্থকতা, এবং তন্মূলেই গীতার উপদেশরাজির উপযোগিতা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।

অর্জ্জুনের আদেশ অনুসারে সারথি শ্রীভগবান রথ যথাস্থানে লইয়া গিয়া কৌরবগণকে দেখাইয়া দিবার ছলে যেমন তাঁহাকে বলিলেন,—"পার্থ পশ্যৈতান সমবেতান্ কুরূনীতি"—হে পার্থ! যুদ্ধার্থ সমবেত এই কৌরবগণকে দেখিয়া লও; অমনি অর্জ্জুন উভয় সৈন্যদলে পিতৃস্থানীয় পিতৃব্যাদি ব্যক্তিবর্গ, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও সুহৃদ্ প্রভৃতি স্বজনবর্গকে দেখিয়া তাঁহাদের নিধনাশঙ্কায় প্রাকৃত জনের ন্যায় নিতান্ত করুণার্দ্রচিত্ত ও শোকসন্তাপে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন! সেকালের অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুনের মনোবৃত্তির এমন আকস্মিক বিপর্য্যয়ে বস্তুতই বিস্ময়বিমূঢ় হইতে হয়, কারণ বাল্যাবধি যে কৌরবগণের অমানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া তিনি তাহাদের নিধন-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এবং ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপী

চেষ্টার ফলে যে মহাযুদ্ধের আয়োজন করিয়া তিনি বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত সমর আরম্ভ করিয়াছিলেন, নিমেষের মধ্যেই সেই চিরশত্রুগণকে নিতান্ত আপনার জন মনে করিয়া তাহাদিগের রক্ষার্থ ক্ষাত্র ধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক যুদ্ধবিমুখ হইয়া রথের উপর বসিয়া পড়িলেন, এতদপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার কল্পনায় আনাও কঠিন !!

যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজনবর্গকে দেখিয়া সে সময় অর্জ্জুনের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কিরূপ বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, প্রথম অধ্যায়ের ২৮—৩৬ শ্লোকে তিনি তাহা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—"হে কৃষ্ণ! যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত এই স্বজনদিগকে দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে, শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে, আমার হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, এবং আমার গাত্রচর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। হে কেশব! আমি আর রথের উপর অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না, আমার মন যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে, এবং আমি বিপরীত লক্ষণ সকল দেখিতে পাইতেছি। এই যুদ্ধে স্বজনবর্গকে বধ করিলে, আমাদের কোনই মঙ্গল হইবে বলিয়া মনে হয় না। হে কৃষ্ণ! আমি বিজয় চাহি না, এবং রাজ্য কিম্বা সুখলাভেও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যলাভ, সুখভোগ, অথবা জীবনধারণেই বা কি কল্যাণ হইবে? কারণ যাহাদের জন্য রাজ্য ও সুখভোগের কামনা করিব, সেই

স্বজনবর্গ ই সম্পদ ও জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে সমবেত হইয়াছে। হে মধুসূদন! ইহারা যদি আমাদিগকে বধ করিতেও প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও আমি ইহাদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। সামান্য পার্থিব সাম্রাজ্যতো অতি তুচ্ছ কথা, সমগ্র ত্রৈলোক্যের রাজত্বলাভের নিমিত্তও আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করিতে চাহি না। ইহারা আমাদের আততায়ী হইলেও, ইহাদিগকে হত্যা করিলে আমাদিগকে পাতকভাজন হইতে হইবে। সুতরাং সবান্ধবে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে হত্যা করা আমাদের পক্ষে কখনই সঙ্গত নহে। হে মাধব! আত্মীয়গণকে বধ করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব?"

মহাসমরে প্রবৃত্ত সেকালের অদ্বিতীয় বীরচূড়ামণির দৈহিক ও মানসিক অবস্থার কি ভয়ঙ্কর আকস্মিক আবর্ত্তন! স্বজনবধের আশঙ্কায় এমনভাবে অভিভূত হওয়া একেবারে অসম্ভব না হইলেও অর্জ্জুনের পক্ষে ইহা যে একান্তই অস্বাভাবিক, এমন কথা অবাধেই বলা যাইতে পারে। অর্জ্জুনের উল্লিখিত উক্তি হইতে স্বত এব ইহাই মনে হয়, তিনি যেন কোনরূপ পরিণাম বা ফলাফল চিন্তা না করিয়াই নিতান্ত অর্বাচীনের ন্যায় এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল বিবেচনার পর যে কার্য্য করা যায়, তাহার পরিণাম আশঙ্কায় কোন সাধারণ মনুষ্যও এভাবে আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না— অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষ-প্রধানের পক্ষে তাহাতো একেবারেই অস্বাভাবিক। কেবল ইহাই নহে, অর্জ্জুন তখন মমতার মোহে

এমন বিবেকবিমূঢ় হইয়াও পড়িয়াছিলেন যে, স্বয়ং ভগবানের নিকটও আততায়ীবধে ও কুলক্ষয়ে পাতকের কথা কহিয়া আপনার যুদ্ধবিমুখতা সমর্থন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। সে সময় যদি তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিতেন. যে, সর্ব্বধর্ম্মের যিনি লক্ষ্যীভূত ও সর্ব্বকল্যাণের মূলাধার তাঁহারই সহিত তিনি কথা বলিতেছিলেন, তাহা হইলে নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা না করিয়া কখনই এইরূপ বাচালতা প্রকাশে প্রণোদিত হইতেন না। কাযেই অর্জ্জুনের তাৎকালিক আচরণ তাহার পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত হওয়াতে, শ্রীভগবান প্রথমেই শ্লেষবাক্যপ্রয়োগে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য বলিয়াছেন,—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ২য় অঃ ২-৩

—হে অর্জ্জুন! এই ভয়ঙ্কর সমরসঙ্কটকালে তোমার এরূপ অনার্য্যোচিত, স্বর্গগতির বিরোধী ও অযশস্কর চিত্তবিকৃতি সংঘটিত হইল কিরূপে? হে পার্থ! তুমি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইও না, তোমার ন্যায় বীরচূড়ামণির উহা একান্ত অনুপযুক্ত। হে শত্রুতাপন! এই সামান্যজনোচিত হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া সত্বর যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও। আর্য্য-সন্তানের পক্ষে অনার্য্যত্বের এবং বীরাগ্রগণ্যের পক্ষে ক্লীবজনোচিত কাপুরুষতা ও সাধারণ লোকের ন্যায় হৃদয়ের দুর্ব্বলতার অপবাদ

অপেক্ষা অধিকতর গ্লানির কথা আর কিছুই নাই। শ্রীভগবান যখন তাঁহার প্রিয়সখার প্রতি এইরূপ কটুবাক্যপ্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই, তখন অর্জ্জুনের তাৎকালিক আচরণের অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর কোথায়?

কেন এমন হইল—

অর্জ্জুনের মনোবৃত্তির এইরূপ বিষম বিপর্য্যয় সহসা সংঘটিত হইল কিরূপে, তাহাই এখন চিন্তনীয়। কৌরবগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা অর্জ্জুন যে কখনও চিন্তা করেন নাই, অথবা উহা বিস্মৃতিসলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, ইহা কল্পনায় আনাও অসম্ভব; বরং এসকল বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াই যে তিনি সেই চিরশত্রুগণের উচ্ছেদসাধনার্থ এই মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, মহাভারতে তাহার বহু প্রমাণই বিদ্যমান আছে। এ অবস্থায় শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হওয়ামাত্র অর্জ্জুন তাহাদেরই মমতায় অতিমাত্র অভিভূত হইয়া পড়াতে, তাঁহার দেহে নানারূপ বিকার-লক্ষণ প্রকাশ পাইল, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন, বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত এমন অঘটন কখনই ঘটিতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন, অর্জ্জুন কৌরবগণের প্রতি বিদ্বেষবশে সমরে প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহাদের সংহারসাধনরূপ সঙ্কট-মুহূর্ত্ত যখন উপস্থিত হইল, তখন মানবোচিত মমতায় মুগ্ধ হইয়া সেই লোমহর্ষণ কাণ্ড হইতে নিবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা তাঁহার পক্ষে

কথনই অস্বাভাবিক নহে; কাযেই তিনি স্বজনগণের রক্ষার জন্য যুদ্ধবিমুখ হইয়াছিলেন। ইহাদের মতে, যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতির বিষয় তখন জাজ্জ্বল্যমান হইয়া প্রতিভাত হওয়াতেই অর্জ্জুনের অঙ্গ অবসন্ন, মুখ বিশুষ্ক, শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত, হস্ত শক্তিহীন এবং গাত্রচর্ম্ম দগ্ধ হইতেছিল। এরূপ অনুমান একান্ত অযৌক্তিক না হইলেও, এসম্বন্ধে একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে রথ লইয়া যাইতে আদেশ কবার পূর্ব্বে অর্জ্জুন যখন শত্রু-সংহারকল্পে ধনু উত্তোলন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার এইরূপ ভাবান্তব ঘটিলেই তাহা সর্ব্বথা স্বাভাবিক হইত, এবং তাহা হইলেই এভাবে উহা সমর্থন করাও চলিতে পারিত। কিন্তু শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুন রথ উভয়সৈন্যের মধ্যস্থলে লইয়া যাইতে আদেশ করিলে, সারথি শ্রীকৃষ্ণ যেমন যথাস্থানে রথ লইয়া গিয়া বলিলেন, "অর্জ্জুন! এই সমবেত কৌরবগণকে দেখিয়া লও", অমনি যখন তিনি এভাবে মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের কৌরবপ্রদর্শন ব্যাপারের সহিত যে উহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে, একথা অস্বীকাব করা যায় কিরূপে? ভগবান কৌরবগণকে দেখাইয়া দেওয়ার পূর্ব্বে বা তাহার কিছুকাল পরে যদি এ ব্যাপার ঘটিত, তাহা হইলে তাহার অন্য কারণ অনুমান অসঙ্গত হইত না; কিন্তু যেমন শ্রীকৃষ্ণের কৌরবপ্রদর্শন অমনি যখন স্বজনের মমতায় অর্জ্জুনের মোহমুগ্ধতা, তখন এই উভয় ব্যাপারের সম্বন্ধ অবাধেই অনুমান করা

যাইতে পারে। অবশ্যই, কাকতালীয় ন্যায়ে উভয়ই সমকালীন হইলেও সম্বন্ধশূন্য হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যে অর্জ্জুন নর-নারায়ণের নরাবতার এবং সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত বলিয়া শ্রীভগবানের সমপ্রাণ সখা, তেমন পুরুষপ্রবর দীর্ঘকাল আয়োজন-উদ্যোগের ফলে মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়া, সহসা স্বভাবের গতিতে শত্রুপক্ষের মমতায় এমন আত্মবিস্মৃত হইতে পারেন কি না। অঘটন-ঘটনপটিয়সী মহামায়ার মহিমায় সকলই সম্ভবপর হইলেও, তৎফলে এমন পলকে প্রলয় সংঘটনের দৃষ্টান্ত সংসারে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না; কাযেই কেবল মায়ার স্বাভাবিক প্রভাবেই অর্জ্জুনের দেহে ও মনে এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তেমন অনুমান সমর্থন করা কঠিন। সমস্ত অবস্থা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, ভগবদিচ্ছায় প্রভাবান্বিত হওয়াতেই অর্জ্জুনের উপর মায়ার এমন প্রবল পরাক্রম প্রসৃত হইয়া থাকিবে। কৌরবগণকে দেখাইয়া দিবার সময়ই চক্রিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কল্যাণকামনায় তাঁহার উপর এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং তৎফলেই অর্জ্জুন এমন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কথা উঠিতে পারে, শ্রীভগবান অর্জ্জুনের উপর এইরূপ মায়াজাল বিস্তার করিবেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, অর্জ্জুন স্বকীয় শৌর্য্য-বীর্য্যের গর্ব্বে ও শত্রুপক্ষের প্রতি ক্রোধের বশে অবিবেকীর ন্যায় আত্মবিস্মৃত

হইয়া পড়াতে, যুদ্ধকালে বুদ্ধির দোষে প্রমাদবশতঃ বিপন্ন হইতে পারেন, এরূপ মনে করিয়া শ্রীভগবান তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে যত্নবান হইবেন, ইহা সর্ব্বথা স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল হইতেই অর্জ্জুন বৈরনির্য্যাতনের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন; কাযেই সে বিষয়ে যে তাঁহার প্রবল আসক্তি জন্মিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। সেই আসক্তি হইতে কাম বা প্রবল বাসনার উদ্রেক হইয়াছিল; সুতরাং কাম বা বাসনার পথে যাহারা অন্তরায়, তাহাদের প্রতি ক্রোধের আতিশয্যে অধীর হইয়া তিনি উভয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে গমন পূর্ব্বক প্রতিপক্ষের বীরগণকে স্বহস্তে সংহারের সহজ উপায় নির্ণয় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রোধ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া থাকে, এবং মোহমুগ্ধ করিয়া তাহার বিনাশ আনয়ন করে। অর্জ্জুনের এই সম্ভাবিত সর্ব্বনাশের নিবারণ-কল্পেই ভগবান মায়াজাল বিস্তার করিয়া থাকিবেন।

বিষয়চিন্তাজনিত কাম ও ক্রোধের ফলে যে জীব বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, সে কথা শ্রীভগবান গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬২-৬৩ শ্লোকে অর্জ্জুনকে বিশেষভাবেই বুঝাইয়া বলিয়াছেন; যথা—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

—কোন বিষয় দীর্ঘকাল চিন্তা করিলে, মানুষের তাহাতে

আসক্তি জন্মে ; সেই আসক্তি হইতে কাম বা বাসনার উদ্ভব হয়, এবং কামপূরণের ব্যাঘাতে ক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে। ক্রোধ হইতে মোহের উৎপত্তি হয়, এবং মোহের ফলে স্মৃতি-বিভ্রম ঘটে ; স্মৃতিভ্রংশ ঘটিলে বুদ্ধিনাশ হয়, এবং বুদ্ধি-নাশের ফলে মানুষ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে, এই কাম এবং ক্রোধকে ভগবান মানবের প্রধান শত্রু বলিয়া তৃতীয় অধ্যায়ে, এবং নরকের দ্বার ও আত্মনাশের কারণ বলিয়া ষোড়শ অধ্যায়েও বর্ণন করিয়াছেন ; যথা—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩য় অঃ—৩৭
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ১৬অঃ—২১

যে কাম ও ক্রোধের পরিণাম এত ভয়াবহ, অর্জ্জুন তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া ভগবান তাঁহাকে উহা হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আত্মগৌরব-জনিত ক্রোধের আবেশে অর্জ্জুন যেরূপ অন্ধীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চৈতন্যোৎপাদন সহজসাধ্য ছিল না ; তাই করুণাময় শ্রীভগবান তাঁহাকে মায়াভিভূত করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উপদেশপ্রদান প্রয়োজন মনে করিয়া থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত যে সনাতন ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত ভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন ('ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'), সেই ধর্ম্মের মূল-

তত্ত্ব ও তাহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে নানারূপ মতবাদ প্রচারিত হওয়াতে তখন ধর্ম্মজগতে যে সমস্যার সমুদ্ভব হইয়াছিল, তাহার সমাধান করিয়া পুনরায় ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন এই সুযোগে গীতামৃতপ্রচার দ্বারা তাহার সুব্যবস্থা করাও ভগবানের এই মায়াজাল বিস্তারের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া অসম্ভব নহে। তাই মনে হয়, অর্জ্জুনের এবং তৎসঙ্গে মানবসমাজের পরম কল্যাণসাধনরূপ শুভেচ্ছা বশেই যে ভগবান এইরূপ মায়া বিস্তার করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করিতে বোধ হয় বুদ্ধিমানগণ আপত্তি করিবেন না। এইরূপ মায়াবিস্তার শ্রীভগবানের রীতিবিরুদ্ধও নহে; মানব-গণকে এভাবে মায়ামুগ্ধ করিয়াই তিনি সংসারপথে পরিভ্রমণ করাইয়া থাকেন। তাই গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬১ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

> "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"

—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক মায়া দ্বারা তাহাদিগকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় সংসারে পরিভ্রমণ করান। সুতরাং অর্জ্জুনের উপর ভগবানের মায়াবিস্তারের কথা অসম্ভব বলিয়া উপেক্ষাযোগ্য নহে।

আত্মাভিমান বা অহংকার হইতে ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এবং ভেদবুদ্ধিজাত বিদ্বেষ বা বিরক্তি হইতেই ক্রোধ জন্মে; সুতরাং অহঙ্কারের অভাবে ভেদবুদ্ধি বিলুপ্ত এবং মমতার

মোহে অনুরাগের আবির্ভাব হইলেই ক্রোধও অন্তর্হিত হইয়া থাকে। আপনার জ্ঞানে আত্মাভিমান ও বিরক্তি বা বিদ্বেষের স্থান নাই, এবং অভাবজনিত কামনা বা বাসনাও তথায় প্রবলভাবে দেখা দেয় না; অতএব মমত্ব বা মমতার উদ্রেকই অভিমান, বাসনা ও বিদ্বেষ বিলোপের সহজ ও সরল উপায়। তাই শ্রীভগবান মায়াবিস্তারপূর্ব্বক কৌরব-গণের প্রতি অর্জ্জুনের মমত্ব-বোধ উৎপাদন করিয়া, তাঁহার অহংকার, কামনা ও ক্রোধ প্রশমিত করার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা না করিলে, ক্রোধের পরিণামে মোহগ্রস্ত হইয়া বুদ্ধিনাশে অর্জ্জুনের বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব হইত না। সুতরাং অর্জ্জুনের কল্যাণের নিমিত্তই শ্রীভগবান মায়াবিস্তার প্রয়োজন মনে করিয়া থাকিবেন।

মায়ার প্রভাবে মোহমুগ্ধ থাকাতেই মানবগণ মায়াতীত পরম পুরুষকে জানিতে না পারিয়া, আপনাতে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি আরোপ করতঃ সংসারপথে পরিভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। মায়াই সৃষ্টির মূলীভূত বলিয়া সৃষ্ট জীব সহজে উহা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে; একমাত্র ভগবৎশরণাগতি দ্বারাই মানব উহার প্রভাব হইতে উদ্ধার পাইতে পারে। তাই গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ১৩—১৪ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

গীতায় অর্জ্জুনের আচরণে এই ভগবদুক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণই পাওয়া গিয়া থাকে। ত্রিগুণের প্রভাবে মোহাভিভূত হইয়া পড়াতেই অর্জ্জুন স্বয়ং ভগবান সারথিরূপে সম্মুখে থাকিলেও, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ না করার নিমিত্ত গীতার প্রথম অধ্যায়ে নানারূপ কারণ প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হ'ন নাই, এবং অবশেষে ধর্ম্মহানির কথা বলিয়া যুদ্ধবিমুখ হইয়াছিলেন। তার পর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবানের তীব্র শ্লেষবাক্যে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ভগবানের চরণে শরণগ্রহণপূর্ব্বক যখন বলিলেন,—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"—প্রভো! আমি তোমার শরণাগত শিষ্য, আমাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার কর—তখনই ভগবান্ গীতামৃত পান করাইয়া তাঁহাকে মোহমুক্ত করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবী মায়ার প্রভাব যে নিতান্ত দুরতিক্রম্য, গীতায় তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান। শ্রীভগবান কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের গুহ্য রহস্য বিষয়ে বহুবিধ উপদেশ প্রদান, এবং স্বকীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াও অর্জ্জুনকে মোহমুক্ত করিতে পারেন নাই; অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া তিনি বিনাশের ভয় দেখাইয়াই যে অর্জ্জুনকে প্রকৃতিস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৫৮ শ্লোকের ভগবদুক্তি হইতেই এ বিষয়ের পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে ; যথা—

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

—অর্জ্জুন! তুমি যদি মদ্গতচিত্ত হও, তাহা হইলেই আমার অনুগ্রহে দুস্তর সংসার-দুঃখ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে; আর যদি তুমি অহংকারজনিত অভিমানে উন্মত্ত হইয়া আমার উপদেশ শ্রবণ না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। কেবল ইহাই নহে, প্রথম অধ্যায়ের ৩৬—৪৪ শ্লোকে অর্জ্জুন স্বজনবধে ও কুলক্ষয়ে যে গুরুতর পাপের কথা বলিয়াছেন, জ্ঞানোপদেশেও তাঁহার সেই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত না হওয়াতে, অবশেষে ভগবান ধর্ম্মের গুহ্যতম রহস্য প্রকাশ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে অভয় দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন ; যথা—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

১৮শ অধ্যায়, ৬৫।৬৬ শ্লোক।

— তুমি মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হও, আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি কার্য্য অনুষ্ঠান কর, এবং আমার চরণে প্রণত হইয়া আমারই শরণাগত থাক। যেহেতু তুমি আমার প্রিয়পাত্র, তাই তোমার নিকট আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ঐরূপ করিলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে

প্রাপ্ত হইবে। তুমি বিবিধপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে নিরত না হইয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও; আমিই তোমাকে সর্ব্বপ্রকার পাতক হইতে উদ্ধার করিব। সুতরাং পাপের আশঙ্কায় তুমি শোকাভিভূত হইও না।

ইহার পূর্ব্বেও ভগবান এই ভাবের কথা গীতায় কয়েক বারই বলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে অর্জ্জুনের চৈতন্যোদ্রেক হয় নাই। অবশেষে বিনাশের ভয়েই তিনি শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া মোহমুক্ত হইয়াছিলেন। তাই অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোকে গীতার উপসংহারকালে ভগবান যখন অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পার্থ! তোমাকে এই যে সর্ব্বগুহ্যতম তত্ত্ব বলিলাম, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শুনিয়াছ কি? যদি শুনিয়া থাক, তবে হে ধনঞ্জয়! তৎফলে তোমার অজ্ঞানসম্ভূত মোহ সম্পূর্ণরূপে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে তো? তখনই কেবল অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

—হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার মোহ দূরীভূত হইয়াছে, এবং আমি আমার পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিয়াছি। আমার সন্দেহ অপগত হওয়াতে, আমি এখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছি; সুতরাং এখন আমি তোমার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্যই করিব। ইহার পরই অর্জ্জুন পুনরায় মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রমাণ—

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও বিষ্ণুমায়ার প্রভাব এইরূপই বর্ণিত আছে। মহারাজ সুরথ শত্রুদলের আক্রমণে রাজ্যচ্যুত হইয়া, এবং সমাধি নামক একজন সমৃদ্ধ বৈশ্য ধনলুব্ধ স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গ কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব ও গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া মেধস মুনির আশ্রমে আসিয়াছিলেন। মুনির আশ্রমে আসিয়াও রাজ্যচ্যুত রাজা রাজ্যের চিন্তায়ই ব্যাকুল ছিলেন, এবং পত্নী-পুত্রাদি কর্ত্তৃক বহিষ্কৃত বৈশ্যও তাহাদেরই মঙ্গলামঙ্গলচিন্তায় আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমাধি যখন এ অবস্থায়ও সুরথকে পরিজনবর্গের প্রতি মমতার কথা বলিলেন, তখন রাজা বিস্মিতচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্॥

—হে বৈশ্য! ধনলুব্ধ যে স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গ ধন কাড়িয়া তোমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতিও তোমার মন স্নেহবদ্ধ হইতেছে কেন? উত্তরে বৈশ্য বলিলেন,—

এবমেতদ্‌যথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ।
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ॥
যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
পতিস্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ॥
কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥

—রাজন্। আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থ; কিন্তু কি করি, আমার মন কিছুতেই পরিজনবর্গের প্রতি নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করিতে পারিতেছে না। যাহারা ধনলুব্ধ হইয়া পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম ও স্বজনপ্রীতি বর্জ্জনপূর্ব্বক আমাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছে, তাহাদেরই প্রতি আমার মন অনুরাগসম্পন্ন। হে মহামতে! বন্ধুগণ যে আমার উপর বিরূপ তাহা জানিয়াও আমার চিত্ত যে কেন তাহাদেরই প্রতি প্রীতিযুক্ত হইতেছে, তাহাতো বুঝিতে পারিতেছি না।

সমাধির ঐ কথা শুনিয়া মহারাজ সুরথ ভাবিলেন, তাঁহার নিজের মনোভাবও তো এইরূপই; তাই উভয়ে মিলিয়া তাঁহারা মেধস ঋষির নিকট গমন করিলেন, এবং সুরথ ঋষিবরের নিকট উভয়ের অবস্থা নিবেদন করিয়া বলিলেন,—"আমরা বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়াও তৎপ্রতি মমতায় আকৃষ্ট হইতেছি। আমরা উভয়েই জ্ঞানবান হইলেও, বিবেকহীন ব্যক্তির ন্যায় আমাদের এরূপ মোহ জন্মিতেছে কেন?"

মানুষা মনুজব্যাঘ্র! সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥
তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

—হে নরশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণ যে প্রত্যুপকারের আশায়ই লোভবশতঃ সন্তানগণের প্রতি স্নেহশীল হয়, ইহা কি দেখিতে পাও না? (যদিও সেই আশা সকল সময় ফলবতী না হওয়াতে তাহাদের স্নেহ-দুঃখজনকই হয়) তথাপি এই সংসারের স্থিতিরক্ষাকারী ভগবান শ্রীহরির মহামায়ার প্রভাবে তাহারা মমতারূপ আবর্ত্তবিশিষ্ট মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া থাকে। ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই, যেহেতু এই মহামায়া জগৎপতি শ্রীহরিরও যোগনিদ্রাস্বরূপ, অর্থাৎ— এতৎপ্রভাবে শ্রীহরিও নিদ্রিত বা মোহাভিভূত হইয়া থাকেন, এবং এই মহামায়ার শক্তিতেই সমগ্র জগৎ মোহমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই মহামায়ারূপিণী ভগবতী দেবী জ্ঞানিগণেরও চিত্ত বলপূর্ব্বক বিবেক হইতে আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবানও মায়া সম্বন্ধে একথাই বলিয়াছেন।

ধনলুব্ধ স্বজনবর্গ সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করিয়া সমাধিকে স্বগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেও, মহামায়ার মহিমায় তাঁহার চিত্ত যেমন তাঁহাদের প্রতিই স্নেহপরায়ণ ছিল, যুদ্ধারম্ভে অর্জ্জুনের অবস্থাও অকস্মাৎ সেইরূপই হইয়া পড়িল! দুষ্টাত্মা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের অত্যাচারে পাণ্ডবগণের দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না; তথাপি অর্জ্জুন সেই দৌরাত্ম্যকারিগণের উচ্ছেদসাধনার্থ মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াও সহসা তাঁহাদেরই মমতার মোহে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব—

গীতার পূজ্যপাদ টীকাকারগণের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রভাবে অর্জ্জুনের মনোভাবের এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অর্জ্জুনের তাৎকালিক মনোভাব ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমায় সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর হইলেও, তাঁহার দেহে যে সকল বিকারলক্ষণ দেখা দিয়াছিল, তাহা ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবজাত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। তার পর, ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমায় চিত্তে সত্ত্বগুণেরই উদ্রেক হইতে পারে, তমোগুণসম্ভূত মোহ কখনই ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে প্রসূত হইতে পারে না। অর্জ্জুনের সেই দৈহিক ও মানসিক বিপ্লব যে তমোগুণাত্মক মমতার মোহ হইতে উদ্ভূত, সেকথা অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৭৩ শ্লোকে অর্জ্জুন স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, এবং শ্রীভগবানও সেজন্যই তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া তত্ত্বোপদেশ প্রদানপূর্ব্বক মোহমুক্ত করিয়াছিলেন।

গীতার প্রথম শ্লোকে প্রযুক্ত প্রথম পদ "ধর্ম্মক্ষেত্রে"র সার্থকতা অবশ্যই আছে; কিন্তু তাহা অন্যরূপ। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের বিশ্বাস ছিল, উভয় পক্ষ যখন কুরুক্ষেত্রের ন্যায় 'চিরপবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই ক্ষেত্রের মহিমায় তাঁহাদের চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইবে, এবং তৎফলে তাঁহারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্তি সংস্থাপন করিবে। কিন্তু তাহা যখন হইল না, এবং দশদিন পর্য্যন্ত প্রচণ্ড পরাক্রমে যুদ্ধ

করিয়া ভীষ্মদেব শরশয্যায় নিপতিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি সঞ্জয়ের মুখে শুনিতে পাইলেন, তখনও তিনি আস্তিক্যবুদ্ধির বশে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থ সম্মিলিত হইলেও, কোন পক্ষের মনোবৃত্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই, ইহা যে আমি সম্ভবপর বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছি না; সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ করার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে সম্মিলিত হওয়ার পর আমার ও পাণ্ডুর পুত্রগণ কি করিয়াছিল, তাহা আমাকে খুলিয়া বল।" অন্ধরাজের এই প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জয় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। কারণ, যে দুর্য্যোধন অত্যধিক অহংকারে উন্মত্ত থাকিয়া চিরদিনই পাণ্ডবদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি বহুসংখ্যক অজেয় বীর এবং পাণ্ডবপক্ষের দেড়গুণেরও অধিক সৈন্যসহ কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে আসিয়াই পাণ্ডব-ব্যূহদর্শনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত দ্রুতগতিতে পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষের শিক্ষাগুরু এবং স্বকীয় প্রধান সেনাপতি দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণ লইলেন। দ্রোণাচার্য্যের নিকট দুর্য্যোধনের উক্তি—"পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্"—হইতেই তাঁহার ভীতিবিহ্বলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তার পর, পাণ্ডবপক্ষের বীরগণের বর্ণনায় দুর্য্যোধন যেরূপ উচ্চকণ্ঠ, নিজ পক্ষের বীরগণ সম্বন্ধে তিনি তদ্রূপ নহেন। কেবল ইহাই নহে, নিজ পক্ষের ভীষ্মাভিরক্ষিত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনাও তিনি অপ্রচুর

বলিয়া বর্ণন করিয়া, ভীমাভিরক্ষিত পাণ্ডবপক্ষীয় সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনাকেই প্রচুর মনে করিয়াছেন ; যথা—

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥
১ম অধ্যায়, ১০ শ্লোক ।

দুর্য্যোধনের এইরূপ আতঙ্ক দেখিয়া মনে হয়, ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমায়ই তাঁহার অহঙ্কার অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল ; তাই তিনি তখন হীনবল পাণ্ডবগণকে দেখিয়াই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন। পাণ্ডবপক্ষের প্রধান পুরুষ অর্জ্জুনও সাময়িকরূপে মমতার মোহে অভিভূত হইয়া পড়াতেই, ধর্ম্মের রহস্য সম্বন্ধে গীতার উপদেশলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার ঐরূপ মোহও পরমকল্যাণেরই কারণ হওয়াতে, তাহাতেও ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবই প্রমাণিত হইতে পারে। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষের দুইজন অধিনায়কের উপরই ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব প্রসৃত হইয়াছিল বলিয়া সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ধর্ম্মক্ষেত্রের গুণে দুর্য্যোধনের দর্প এবং অর্জ্জুনের গর্ব্ব উভয়ই মন্দীভূত হওয়াতে, সত্ত্বগুণের আবির্ভাবই অনুমিত হইয়া থাকে। গীতার প্রথম শ্লোকস্থিত প্রথম পদের ইহাই সার্থকতা।

বেদান্তের প্রস্থানত্রয়।

প্রথম প্রস্থান—উপনিষদ্

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদান্তের চরম প্রস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। চরম প্রস্থান বলিতে বোধ হয় ইহাই বুঝা যায় যে, বেদান্তের প্রথম ও মধ্যম প্রস্থানে যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহার সমন্বয়সাধন-পূর্ব্বক শেষ মীমাংসা করা হইয়াছে। বেদের চরম ভাগ উপনিষদ্‌ই বেদান্তপদবাচ্য—"বেদান্তো নাম উপনিষদ্"। বেদের শেষ সিদ্ধান্ত ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্‌সমূহে আলোচিত হওয়াতেই উহা বেদান্ত নামে অভিহিত হয়; এজন্য ব্রহ্মবিদ্যাও উপনিষদের নামান্তর—"সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ পদবাচ্যা"। সুতরাং উপনিষদ্‌ই যে বেদান্তের প্রথম প্রস্থান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্বয়ং ব্রহ্মাই ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তক; কেবল ব্রহ্মবিদ্যা কেন, সকল বিদ্যাই ব্রহ্ম হইতে প্রথম প্রসৃত হইয়াছে। জ্ঞানময়ত্বই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" সুতরাং সর্ব্ববিধ জ্ঞানপ্রকাশক শাস্ত্রসমূহের যে তিনিই প্রবর্ত্তক, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। এজন্যই মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন,—"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"—তিনি তত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রসমূহের উৎপাদক বলিয়াই সর্ব্বজ্ঞ। শ্রুতির নির্দ্দেশ এই যে, বেদাদি শাস্ত্রসমূহ

ব্রহ্মের নিঃশ্বাসের সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে ; যথা—'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতং যদেতদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ, ইত্যাদি। শাস্ত্রসমূহ ব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত বলিয়া অপৌরুষেয়। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মই যে আদিপুরুষ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদাদি শাস্ত্র সকল নিহিত করেন, শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের শ্রুতিতে সে তত্ত্ব পরিব্যক্ত আছে ; যথা—"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ"।

ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মাই অগ্রে ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদান্ততত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন ; অথর্ব্বা সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরাকে, অঙ্গিরা ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ অঙ্গিরা নামক অপর ঋষিকে তাহা উপদেশ করেন বলিয়া মুণ্ডক উপনিষদের শ্রুতিতে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত আছে,—

> ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমং সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
> স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥
> অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাঽথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
> স ভরদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাম্॥

ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্রুতিতে প্রকাশ, এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্মা প্রজাপতিকে, প্রজাপতি মনুকে এবং মনু মানবদিগকে উপদেশ করিয়াছেন :— 'এতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ।" ব্রহ্মাই যখন ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্ত্তক,

তখন উপনিষদুক্ত বেদান্ততত্ত্ব অপৌরুষেয় বলিয়া অভ্রান্ত, এবং উপনিষদ্ই বেদান্তের মূল বা প্রথম প্রস্থানস্বরূপ।

ব্রহ্মের দ্বিবিধ বিভাব—

সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ

অষ্টোত্তর শতোপনিষদের মধ্যে যে দশখানির প্রামাণিকতা সর্ব্ববাদিসম্মত, তাহাতেও ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয়বিধ বিভাবই পরিদৃষ্ট হয়। ব্রহ্মের সবিশেষ সবিকল্প, সগুণ ও সক্রিয় বিভাবাত্মক বহু শ্রুতিই যেমন উপনিষদসমূহে পরিদৃষ্ট হয়, তেমন নির্ব্বিকল্প, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বিভাবাত্মক শ্রুতিরও অভাব উপনিষদে নাই। এক পক্ষে উপনিষদ্ বলিতেছেন,—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্"
—এই সমস্ত নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ; কারণ, এই সকল তাঁহা হইতেই জাত, তাঁহাতেই স্থিত এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্ম"। (তৈত্তিরীয়)।

—যাঁহা হইতে এই ভূতসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, সঞ্জাত ভূতনিবহ যাঁহার প্রভাবে জীবিত আছে, এবং অন্তে সমস্ত ভূত যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর; তিনিই ব্রহ্ম, অর্থাৎ—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের যিনি কর্ত্তা, তিনিই ব্রহ্ম।

'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ।

(বৃহদারণ্যক)

—হে গার্গি, এই অক্ষরব্রহ্মের শাসনপ্রভাবেই সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।
মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

—এই যাহা কিছু আছে, সেই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। সেই ব্রহ্ম মহদ্ভয়ের কারণ এবং উদ্যত বজ্রস্বরূপ; তাই সমস্ত তাঁহার ভয়ে স্ব স্ব কার্য্যে নিরত রহিয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মের এই তত্ত্ব বিদিত আছেন, তাঁহারা মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার পাইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। ব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি তাপ প্রদান করে, সূর্য্য তেজ বিকিরণ করে, এবং ইন্দ্র, বায়ু ও যম স্ব স্ব কার্য্যসাধনে ব্যগ্র রহিয়াছে। "তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় (ছান্দোগ্য)—তাঁহার ঈক্ষণ বা ইচ্ছা হইল, তিনি সৃষ্টিবিস্তারের নিমিত্ত বহুরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইবেন।

"সঃ তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।
তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ সত্যঞ্চ অনৃতঞ্চ"॥ (তৈত্তিরীয়)

—তিনি তপস্যা করিয়া, অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা আলোচনা করিয়া,

(যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ) এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, এবং এই সকল সৃষ্টি করিয়া ইহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপ অনুপ্রবেশ দ্বারা তিনি সৎ ও অসৎ, এবং সত্য ও অনৃতে পরিণত হইলেন।

"এতদ্ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যায়ৌ হি ভূতানাম্"। (মাণ্ডুক্য)

—ব্রহ্মই সমস্ত ভূতের যোনি বা উৎপত্তিস্থল; ভূতসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ তিনিই।

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। (ঈশ)

—তিনি সকলের অন্তরে ও সকলের বাহিরে বিরাজমান।

"এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষঃ
সেতুর্বিধরণ লোকানামসম্ভেদায়"। (বৃহদারণ্যক)

—ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি, ইনি ভূতপালক, ইনি বিচ্ছিন্ন লোকসমূহকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের ধারক সেতুস্বরূপ।

"অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ।
বায়ুঃ প্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥
তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ সোমাৎ পর্জ্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্।
পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ॥
পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।" (মুণ্ডক)

—দ্যুলোকই এই পুরুষের মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষুর্দ্বয়, দিক্ সকল শ্রবণেন্দ্রিয়, বেদসমূহ বাক্য, বায়ু প্রাণ এবং সমস্ত বিশ্ব তাঁহার হৃদয়; পৃথিবী এই পুরুষের পদযুগল, এবং তিনিই

সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। এই পুরুষ হইতেই অগ্নি বা দ্যুলোক উৎপন্ন হইয়াছে, সূর্য্য সেই অগ্নির সমিধস্বরূপ; চন্দ্র হইতে মেঘ, এবং মেঘ হইতে ওষধিসমূহ পৃথিবীতে জন্মিয়া থাকে। এই ওষধি হইতেই পুরুষ উৎপন্ন হইয়া স্ত্রীতে গর্ভাধান করে। এই প্রকারে একমাত্র সেই পুরুষ হইতেই বহুপ্রকার সৃষ্ট পদার্থ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিশ্ব, সমস্ত কর্ম্ম, তপস্যা প্রভৃতি সকলই সেই পুরুষে প্রতিষ্ঠিত, এবং তিনিই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম।

"ওঁ সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্॥ (পুরুষসূক্ত)

—সেই সহস্রমস্তক, সহস্রচক্ষু ও সহস্রপদবিশিষ্ট পুরুষ সমস্ত ভূমি আবরণ করিয়া তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াই রহিয়াছেন। ব্রহ্মের সবিশেষ বা সগুণ বিভাবাত্মক এইরূপ বহু শ্রুতিই উপনিষদে আছে; নিদর্শনস্বরূপ এস্থলে কয়েকটী মাত্র উদ্ধৃত হইল।

ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ বিভাবাত্মক শ্রুতিসমূহের মধ্যে কয়েকটী এইরূপ,—

'নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।"
(মাণ্ডুক্য)

- যাঁহার প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখও নহে, অন্তর্ম্মুখও নহে, উভয়-মুখও নহে; যিনি প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও

নহেন ; যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত, আত্মপ্রত্যয়-মাত্রসিদ্ধ, প্রপঞ্চাতীত, শান্ত, শিব, অদ্বৈত ও তুরীয় ; তিনিই আত্মা, তাঁহাকেই জানিতে হইবে।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" (কঠ)

—যিনি শব্দ, স্পর্শ ও রূপবিহীন, অব্যয়, রস ও গন্ধরহিত এবং অক্ষয় ; যিনি অনাদি, অনন্ত, মহত্তত্ত্বের পরে অবস্থিত ও ধ্রুব ; তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

"তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতম-স্নেহমচ্ছায়মতমঃ অবায়ু অনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমশ্চক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাক্ অমনঃ অতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্।" (বৃহদারণ্যক)

—হে গার্গি ! সেই অক্ষর পুরুষকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ নিম্নলিখিত রূপে বর্ণন করিয়া থাকেন—তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, সঙ্গ নহেন, রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, কর্ণ নহেন, বাক্য নহেন, মন নহেন, তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন,—অর্থাৎ আমরা যাহা জানি তাহার কিছুই তিনি নহেন।

"অথাতো আদেশো নেতি নেতি। স এষ নেতি নেতি আত্মা।"—তাঁহার সম্বন্ধে নির্দ্দেশ এই যে, তিনি ইহা নহেন, ইহা নহেন, অর্থাৎ—ইহার কিছুই নহেন; সেই ইহা নহেন,—ইহা নহেন-ই আত্মার স্বরূপ।

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।" (কঠ)

—তিনি ধর্ম্ম হইতে পৃথক্, অধর্ম্ম হইতেও ভিন্ন, কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র, কারণ হইতেও ভিন্ন, অতীত এবং ভবিষ্যৎ হইতেও পৃথক্।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" (তৈত্তিরীয়)

—যাঁহার সন্ধান না পাইয়া বাগাদি দশ ইন্দ্রিয় সহ মন ফিরিয়া আসে।

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।" (মুণ্ডক)

—যিনি চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, অন্তঃকরণ প্রভৃতি এবং তপস্যা বা কর্ম্ম কিছুরই গ্রাহ্য নহেন।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥" (কেন)

—যিনি ব্রহ্মকে জানেন বলিয়া ভাবেন, তিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই। ব্রহ্মকে যিনি জানেন, ব্রহ্ম তাঁহার অবিজ্ঞাত; আর যিনি তাঁহাকে জানেন না, ব্রহ্ম তাঁহারই বিজ্ঞাত।

উভয়বিভাত্মক শ্রুতি—

ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ বিভাব যেমন বিভিন্ন শ্রুতিতে পরিব্যক্ত আছে, তেমন একই শ্রুতিতেও এই উভয় বিভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। সবিশেষ বিভাবাত্মক শ্রুত্যংশে ব্রহ্ম পুংলিঙ্গরূপে, এবং নির্ব্বিশেষ বিভাবাত্মক শ্রুত্যংশে ক্লীবলিঙ্গরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ উভয়বিভাবাত্মক কয়েকটী শ্রুতি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং।
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥"
(মুণ্ডক)

—যিনি অদৃশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের অগোচর), অগ্রাহ্য (কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের অবিষয়ীভূত), গোত্রসম্বন্ধ-শূন্য; যিনি স্থূল-সূক্ষ্মাদিধর্ম্মরহিত, চক্ষু-কর্ণশূন্য ও হস্ত-পদবিহীন; যিনি নিত্য, সমস্ত প্রাণীর নিয়ামক, সর্ব্বব্যাপক, অতীব সূক্ষ্ম, অপরিণামী, এবং সর্ব্বভূতের উৎপাদক; তাদৃশ আত্মাকে বিবেকবান্ পণ্ডিতগণ দর্শন করিয়া থাকেন। এখানে ক্লীবলিঙ্গ "অদ্রেশ্যম-গ্রাহ্যম্" ইত্যাদি পদ কয়টী ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ বিভাবসূচক এবং পুংলিঙ্গ "নিত্যং বিভুং" ইত্যাদি পদ কয়টী তাঁহার সবিশেষ বিভাব-জ্ঞাপক।

"সঃ পর্য্যগাৎ শুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥" (ঈশ)

—সেই পরমাত্মা সর্ব্বগ, অর্থাৎ—আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, শরীরবিহীন, অক্ষত, শিরাদিশূন্য, নির্ম্মল ও পাপ-পুণ্যবর্জ্জিত; তিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান ও স্বয়ং জাত, এবং তিনিই চিরকাল প্রজা ও প্রজাপতিগণের যথার্থ কর্ত্তব্য ও শুভাশুভ কর্ম্মের বিধানকর্ত্তা। এই শ্রুতিতেও নির্ব্বিশেষ বিভাবাত্মক "পর্য্যগাৎ, শুক্রং, অকায়ং, অস্নাবিরং, শুদ্ধং, অপাপবিদ্ধং" এই কয়টী ক্লীবলিঙ্গ পদ এবং "কবিঃ, মনীষী, পরিভূঃ, স্বয়ম্ভূঃ" এই কয়টী সবিশেষ বিভাবজ্ঞাপক পুংলিঙ্গ পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নাপো মাতরিশ্বা দধাতি॥

—তিনি অচল, অথচ মন অপেক্ষাও বেগবান্; তাঁহার গতি নাই, অথচ তিনি সর্ব্বাগ্রে গন্তব্যস্থানে উপনীত হইয়া থাকেন। তিনি স্থির থাকিয়াও গতিশীল সকলের অগ্রগামী। প্রাণ তাহাতে কারণার্ণব নিহিত করেন।

বিভিন্ন শ্রুতিতে যদি কেবল ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ বিভাব স্বতন্ত্রভাবেই পবিব্যক্ত থাকিত, তাহা হইলে এই বিভাবদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টী ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ উঠিতে পারিত। কিন্তু একই শ্রুতিতে যখন সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয় বিভাবই একসঙ্গে পরিদৃষ্ট হয়, তখন নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিতে হইবে, এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই এই দুইটী বিভাব—তিনি যেমন সবিশেষ, তেমন নির্ব্বিশেষও।

উক্ত উভয়বিভাবাত্মক শ্রুতিই কেবল তাহার প্রমাণ নহে, অন্য শ্রুতিতেও এবিষয় স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

"দ্বেবাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তং চামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যং।
চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ।" (বৃহদারণ্যক)

—ব্রহ্মের দুই রূপ, একটী মূর্ত্ত অপরটী অমূর্ত্ত, একটী মর্ত্ত্য বা মরণশীল অপরটী অমৃত, একটী স্থির অপরটী অস্থির, একটী সৎ অপরটী অসৎ। "এতদ্ বৈ সত্যকাম! পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম।" (প্রশ্ন)—হে সত্যকাম! এই ব্রহ্ম পর ও অপররূপ দুই বিভাবসম্পন্ন। "দ্বে পর ব্রহ্মণী অভিধ্যেয়ে শব্দশ্চ অশব্দশ্চ শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।" (মৈত্র)—পরব্রহ্মের দ্বিবিধ বিভাবই ধ্যান করিতে হইবে—শব্দ ও অশব্দ, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম।

ব্রহ্ম যে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয় বিভাবসম্পন্ন, উল্লিখিত শ্রুতিসমূহ দ্বারা তাহা অবিসংবাদিতরূপেই প্রমাণিত হইয়া থাকে; সুতরাং ব্রহ্মের একটী বিভাব অস্বীকার করিয়া অপর বিভাব স্বীকার শ্রুতিসম্মত বিবেচিত হইতে পারে না। ব্রহ্ম একমাত্র সবিশেষ অথবা একমাত্র নির্ব্বিশেষ বিভাবসম্পন্ন, এই উভয় সিদ্ধান্তই শ্রুতিবিরুদ্ধ। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ বিভাব ইন্দ্রিয় ও মনের অধিগত হইতে পারে না বলিয়া উহা শাস্ত্রে অবাঙ্‌মনসোগোচর-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি বলেন, কেবল বিশুদ্ধজ্ঞান-প্রভাবেই উহা ধ্যানের গোচরীভূত হয়; যথা—"জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।" এই শ্রুতিবাক্য হইতেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,

ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ বিভাব সাধারণ সাধকের ধ্যেয় বস্তু নহে; তাঁহারা সবিশেষ বিভাব আশ্রয় করিয়াই সাধনমার্গে অগ্রসর হইবেন, এবং তৎফলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই, নির্ব্বিশেষ বিভাবে নিমগ্ন হইয়া কৈবল্য লাভ করিবেন। শ্রুতির উপদেশও ইহাই; যথা —

> দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে হি শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ।
> শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরংব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ (ব্রহ্মবিন্দু)।

—শব্দব্রহ্ম ও পরংব্রহ্ম এই উভয় ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানই লাভ করিতে হইবে; শব্দব্রহ্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই পরংব্রহ্মে প্রবেশ করা যায়।

শব্দব্রহ্ম—

আর্য্যশাস্ত্রের চরম তত্ত্ব প্রণব বা ওঙ্কারই শব্দব্রহ্ম, এবং ইহাই সবিশেষ বিভাবাত্মক পরংব্রহ্মের বাচক বা প্রতীকস্বরূপ। বিকাশমান বিশ্বের সমস্তই শব্দ দ্বারা পরিব্যক্ত হইয়া থাকে; যতপ্রকার শব্দ সম্ভব হইতে পারে, তাহার সমস্তই এই প্রণবধ্বনি হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং পরিণামে তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়। ওঙ্কারই মূলধ্বনি, এবং ইহা বায়ুর ঘাত-প্রতিঘাতের অপেক্ষা করে না বলিয়া অনাহত আখ্যায় অভিহিত হয়। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান শব্দের আশ্রয়েই অবস্থিত আছে; কাযেই শব্দ ব্যতীত বস্তুনির্দ্দেশের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু বিভিন্ন শব্দ ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানপ্রকাশক

বলিয়া সমগ্র শব্দরাশির একীভূত অবস্থাই পূর্ণজ্ঞানের পরিচায়ক। সবিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ ও সর্ব্বময়; সুতরাং কোন বিশেষ শব্দ তাঁহার বাচক বা প্রতীক হইতে পারে না। এজন্য সমস্ত শব্দের একীভূত অবস্থা প্রণবই একমাত্র তাঁহার বাচক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; তাই মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে সূত্র করিয়াছেন—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"। সমস্ত শব্দের মূলে প্রণব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, পরে পাঠক তাহা বুঝিবার সুবিধা পাইবেন; এখন প্রণব বা শব্দব্রহ্ম অবলম্বনে কেমন করিয়া পরংব্রহ্মে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। মুণ্ডক উপনিষদের শ্রুতিতে ধনু ও শরের উপমা দ্বারা এবিষয় বোধগম্য করা হইয়াছে; যথা—

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥
প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥

—অর্থাৎ, উপনিষদ্‌রূপ মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনা দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত শর-সন্ধানপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া তদ্গতচিত্তে উক্ত শর ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে বিদ্ধ করিবে। এই লক্ষ্যবেধ-ব্যাপারে প্রণবই ধনু, সাধকের আত্মা উহার শর, এবং বিদ্ধ করার লক্ষ্য হইতেছে ব্রহ্ম। শর-সন্ধানকালে যেরূপ

লক্ষ্যে তন্ময় হইতে হয়, তদ্রূপ তদ্গতচিত্ত হইয়া এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে। লক্ষ্যবেধ-ব্যাপারে যেমন ধনু ও শরই প্রধান অবলম্বন, তেমন ব্রহ্মে প্রবেশ করিতেও প্রণব এবং সাধকের আত্মা বা অন্তঃকরণই একমাত্র আশ্রয়।

ব্রহ্মোপনিষদের শ্রুতিতে যজ্ঞাগ্নির উৎপাদক অরণি ও উত্তরারণি নামক কাষ্ঠদ্বয়ের উপমা দ্বারা এতত্ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে; যথা—

আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেৎ নিগূঢ়বৎ॥

পূর্ব্বকালে দুইখানা কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া যজ্ঞের জন্য অগ্নি উৎপাদন করা হইত; এই কাষ্ঠদ্বয়ের নিম্নস্থিত কাষ্ঠখানির নাম অরণি এবং উপরিস্থ কাষ্ঠখানির নাম উত্তরারণি। উক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, অরণি ও উত্তরারণি নামক কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণের ফলে যেমন কাষ্ঠমধ্যস্থিত অগ্নির আবির্ভাব ঘটে, তেমন নিজ আত্মাকে অরণি ও প্রণবকে উত্তরারণিরূপে প্রয়োগ করিয়া ধ্যানরূপ নির্ম্মথন অভ্যাস করিলে, হৃদয়মধ্যে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারা যায়।

এই প্রণব ও আত্মার সংমিশ্রণ বা সংঘর্ষের ফলেই সাধক জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া কৈবল্যলাভের অধিকারী হ'ন। ইহাই শ্রুতির ব্রহ্মবিদ্যা, এবং সদ্গুরুর কৃপায় ইহা অধিগত হইলেই সাধক নিত্যতৃপ্ত হইয়া থাকেন। শব্দব্রহ্মের অনুশীলন বা অনুসরণ ব্যতীত

পরংব্রহ্মে প্রবেশের উপায়ান্তর নাই; তাই শ্রুতি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন,—

"একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্নি সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

এই ত্রিভুবনে একমাত্র হংসই বিদ্যমান আছেন, তিনি জ্যোতিঃ (জ্ঞান) স্বরূপে এই বিশ্বে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব লাভ করা যায়; তাঁহা ব্যতীত আশ্রয়ের আর অন্য কোন উপায়ই নাই। এই হংসই যে প্রণব, রাজযোগের অনুষ্ঠানে তাহা উপলব্ধি করা যায়।

শব্দব্রহ্ম বা প্রণবের সাহায্যে সাধক কিরূপে পরংব্রহ্মে সম্মিলিত হয়, অথবা ব্রহ্মের সবিশেষ বিভাবের সহায়ে কিরূপে নির্ব্বিশেষ বিভাবে উপনীত হওয়া যায়, তাহা প্রকাশযোগ্য না হইলেও, ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত এখানে সংক্ষেপে সেবিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। বুদ্ধিমানমাত্রই অবগত আছেন, আমাদের উভয় ওষ্ঠের সহযোগে যে ধ্বনি বা বাণী ব্যক্ত হয়, তাহা ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে মনে এবং তৎপূর্ব্বে জ্ঞানে বা বুদ্ধিতে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধ্বনি বা বাণীর এই ত্রিবিধ অবস্থা সহজবোধ্য; কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও ধ্বনি বা বাণীর যে আর এক অবস্থা আছে, যাহা মন এবং বুদ্ধিরও অগোচর, তাহাই উহার নিত্যাবস্থা; সেস্থলে ধ্বনি বা বাণীর বিশ্লেষণ বা বিভাগ নাই, সমস্ত ধ্বনিই সম্মিলিত

ভাবে এক মহাধ্বনিরূপে তথায় বিদ্যমান আছে। এই মন ও জ্ঞানের অগোচর অবস্থা সহ ধ্বনির চতুর্ব্বিধ অবস্থা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে; উহাদের নাম যথাক্রমে—বৈখরী, মধ্যমা পশ্যন্তা ও পরা। কোন এক ধ্বনি নিত্যাবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া পশ্যন্তীরূপে জ্ঞানে উদিত হইলে, তাহা মধ্যমারূপে মনে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, এবং অবশেষে বৈখরীরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। পরাতে একীভূত বাণী ক্রমে পশ্যন্তী ও মধ্যমাতে বিশ্লিষ্টভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপর বৈখরীতে উহার স্বাতন্ত্র্য প্রকটিত হইয়া থাকে।

এই পরাধ্বনিই প্রণব, ইহা অব্যাহতভাবে নিত্য বিদ্যমান। বিশ্বের সর্ব্বত্র ইহা অন্তর্নিহিত থাকাতেই ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছে। পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীতে ধ্বনি বায়ুর গতিতে বিকশিত ও বিস্তৃত হইলেও, পরাধ্বনি তদ্রূপ নহে; উহা স্বতঃসিদ্ধ, এবং বায়ুর গতির উৎপাদক। পরাধ্বনি হইতেই বায়ু গতি লাভ করিয়া প্রবহমান হয়, এবং পরাধ্বনির কিঞ্চিৎ সেই বায়ুসহযোগে পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। জীবদেহে এই বায়ুর গতি উৎপত্তি হইতে বিনাশ পর্য্যন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে সতত বিদ্যমান আছে, এবং এই বায়ুর গতিমূলেই জীবের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। এরূপে বায়ুর স্বাভাবিক গতিতে যে ধ্বনি পরিব্যক্ত হইতেছে, তাহার অনুসরণ করিলেই বিলোমক্রমে প্রণবে, এবং তৎপর প্রণব অবলম্বনে শব্দাদিশূন্য পরংব্রহ্মে উপনীত হইতে পারা যায়। অবশ্যই

ইহা যে সদ্‌গুরুর কৃপাসাপেক্ষ, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। জীব-মাত্রেরই ইহা প্রকৃতিদত্ত সহজাত সম্পদ্; অবিদ্যা বা অজ্ঞতার আবরণ নিবন্ধন আমরা এই স্বাভাবিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়া জন্ম-মরণচক্রে বিঘূর্ণিত হইতেছি। সদ্‌গুরু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া উহা প্রদর্শন করেন মাত্র—নূতন কিছু তিনি প্রদান করেন না। এজন্যই সদ্‌গুরুকে প্রণাম করার মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শব্দব্রহ্ম বা প্রণব হইতে বিশ্বের বিকাশ হয় কিরূপে, সে সম্বন্ধেও এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক মনে করি। মানবের দৃষ্টান্ত দ্বারাই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। মানবজীবন ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠানেই উহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে; ভোজন, শয়ন, গমন, উপবেশন, নিদ্রা ও বাসনামূলক অন্যান্য কর্ম্মাদির কোন না কোন ব্যাপারে মানব নিয়ত নিরত রহে। সুতরাং মানুষকে কর্ম্মের প্রতীক বলা অসঙ্গত নহে। কর্ম্মমাত্রই মনের গতিতে বা ইঙ্গিতে সম্পন্ন হয়, এবং বিভিন্ন লোকের জ্ঞান বা বুদ্ধির প্রভাবেই মনও গতিশীল হইয়া থাকে; সুতরাং মানুষ যে প্রথমে মন দ্বারা, এবং তৎপূর্ব্বে জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেকথা বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। জ্ঞান শব্দাশ্রয়ী; শব্দেই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত

আছে, এবং শব্দসহযোগেই উহা বিকাশপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং মানবকে শব্দের পরিণতি অবাধেই বলা যাইতে পারে; কারণ, শব্দ হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব, জ্ঞানের প্রভাবে মনের উদ্দীপনা, এবং তৎফলে ইন্দ্রিয় সহযোগে মানবের ক্রিয়াশীলতা বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। কাযেই একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ক্রিয়াশীল জীবমাত্রেরই বিকাশমূলে শব্দ বিদ্যমান। এই ভাবে চিন্তা করিলে সহজেই বুঝা যাইতে পারে, কেবল ক্রিয়াশীল জীব কেন, সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশই শব্দ হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে। সৃষ্টির মূলে যে শব্দই বিদ্যমান, **"একোঽহং বহু স্যাম প্রজায়েয়"** এই শ্রুতি হইতেও তাহাই প্রতিপাদিত হয়।

শব্দের সংখ্যা নির্ণয়যোগ্য নহে; সুতরাং উহাকে অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু ঋষিগণ প্রজ্ঞাবলে এই অসংখ্য শব্দরাশিরও মূল তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। যত প্রকার শব্দ সম্ভব হইতে পারে, তাহা সমস্তই অকারাদি ষোড়শসংখ্যক স্বর, এবং ক-কারাদি চতুস্ত্রিংশৎ ব্যঞ্জনধ্বনির সহযোগে গঠিত হইয়া থাকে; এই পঞ্চাশৎ সংখ্যক স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির বা বর্ণের সহায়তা ব্যতীত কোন শব্দই ব্যক্ত হইতে পারে না। শব্দই বিকাশের মূলে বিদ্যমান বলিয়া এই পঞ্চাশৎ ধ্বনি বা বর্ণ হইতেই যে বিরাট্ বিশ্বের বিকাশ ঘটে, একথা বলা কখনই অসঙ্গত নহে।

এই পঞ্চাশৎ ধ্বনির উভয় ওষ্ঠ সহযোগে ব্যক্ত হওয়ার

বিষয় স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া ধরিতে পারিলে দেখা যাইবে, উহারা অ উ ম এই ত্রিবিধ ধ্বনিরই অন্তর্ভূত, এবং সন্ধির নিয়মানুসারে উক্ত ধ্বনিত্রয়ের সম্মিলনেই ওঙ্কার বা প্রণব প্রকটিত হয়। অতএব প্রণবই যে সমগ্র ধ্বনি ও সর্ব্ববিধ শব্দের মূলে বিদ্যমান, সে সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবসর থাকিতেছে না। শব্দ দ্বারাই বস্তুর প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়; কাযেই সমগ্র শব্দরাশির একীভূত অবস্থা ওঙ্কার বা প্রণব সর্ব্বস্বরূপ পরংব্রহ্মের প্রতীক। যাহা কিছু জ্ঞান বা বুদ্ধিগম্য, তাহা সমস্তই প্রণবে প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং প্রণব হইতেই উদ্ভূত হইয়া তাহা পরিণামে প্রণবেই পর্য্যবসিত হয়। যেমন বিশ্বের বিভিন্ন সত্তায়, তেমন মানবেও এই প্রণব পরাধ্বনিরূপে অন্তর্নিহিত আছে, এবং উহা হইতেই বায়ু গতিশীল হইয়া বিভিন্ন ধ্বনির উৎপাদন দ্বারা মানবের চিত্তে বিভিন্ন বৃত্তির বিকাশ ঘটায়; কাযেই মানবদেহে শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে বায়ুর যে স্বাভাবিক উর্দ্ধাধঃ গতি নিত্য বিদ্যমান, তন্মূলে উত্থিত ধ্বনির অনুসরণ দ্বারা প্রণবের উপলব্ধি করিতে পারিলেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, এবং তখন সাধক প্রণব অবলম্বনে স্বরূপাবস্থায় বা পরংব্রহ্মে প্রবেশলাভে সমর্থ হইয়া থাকে। এজন্যই মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে সূত্র করিয়াছেন,—"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্"—চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে।

পরাবাণী বা প্রণব পরংব্রহ্মের বাচক বলিয়াই গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

—যিনি "ওম্" এই অক্ষররূপে ব্রহ্মের উপলব্ধি করিয়া আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগপূর্ব্বক পরলোকগমন করেন, তিনিই পরম বা চরমগতি মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গীতার টীকাকারগণ এই শ্লোকের ব্যাহরন্ কথার অর্থ করিয়াছেন "উচ্চারয়ন্" ; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। দেহত্যাগকালে মানবের সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিই বিলুপ্ত হয় বলিয়া, তখন উচ্চারণ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ব্যাহরন্ পদে বিশেষভাবে আহরণ বুঝায় ; এই বিশেষ আহরণ কথাতেই উল্লিখিতরূপে প্রণবের উপলব্ধির ইঙ্গিত পাওয়া গিয়া থাকে।

শব্দব্রহ্ম বা প্রণব যখন ব্রহ্মের বাচক, তখন সংশয় উঠিতে পারে, উহা স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মের সহিত কিম্বা তাহারই অভিব্যক্তিরূপে নিত্য বিদ্যমান। ব্রহ্মই যখন একমাত্র নিত্য সত্য-স্বরূপ, তখন তদতিরিক্ত অন্য কিছুরই সত্ত্বা যে স্বীকার্য্য নহে, সেকথা সম্ভবতঃ কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না ; কাযেই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রভাবে প্রণবের নিত্য বিদ্যমানতার কল্পনা একান্তই অমূলক। তার পর, প্রণব যদি ব্রহ্মের অভি-ব্যক্তি হয় তাহা হইলে, উহা যে ব্রহ্ম হইতেই সমুদ্ভূত, সে সম্বন্ধেও সন্দেহ করা যাইতে পারে না। কারণ ব্রহ্মই যদি প্রণবরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, তবে প্রণবের স্বাতন্ত্র্য সম্ভব হইবে কিরূপে ? বস্তুতঃ প্রণব অবলম্বনেই যখন পরংব্রহ্ম লাভ

হয়, তখন প্রণবের সহিত পরংব্রহ্মের একাত্মতা অবিসংবাদিত। শাস্ত্রমতে প্রণবের নাদ যখন বিলীন হইয়া যায়, তখনই পরং-ব্রহ্ম প্রকাশ পান; সুতরাং একথা অবাধেই বলা যাইতে পারে যে, প্রতীক উপাসনার পরিণতিতে যেমন সাধক প্রতীক ছাড়িয়া উপাস্য দেবতারই উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তেমন প্রণবের অনুসরণ করিলেও পরে প্রণবের বিলয়ে ব্রহ্মেরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সমস্ত শব্দের মূল বলিয়া প্রণবকেই সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মের বাচক বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের কোন নাম বা রূপ থাকিতে পারে না, প্রণব বা শব্দ ব্রহ্মকে তাহার বাচক বলিলে, সেই প্রণব হইতেই ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়। শাস্ত্রমতে নাম হইতেই রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে; কাযেই নাম রূপের পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্মাবস্থা। সাধারণতঃ রূপ হইতেই নামের উৎপত্তি হয় বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তদ্রূপ ধারণা ভ্রমাত্মক। ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, কর্ম্মের বিকাশমান অবস্থাই রূপ। এই কর্ম্মের মূলে যখন শব্দ বিদ্যমান, এবং সেই শব্দ হইতেই যখন বিশ্বের বিকাশ ঘটে, তখন নাম হইতেই যে রূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নাই; কাযেই বাক্য ও মনের অগোচর ব্রহ্ম যখন প্রণবে প্রতিভাত হ'ন, তখনই কেবল তাহার রূপ-গুণাদির কথা কল্পিত হইতে পারে। এজন্যই বলা হইয়াছে, নির্ব্বিশেষ বা নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম শব্দব্রহ্মে সবিশেষ বা সবিকল্পভাবে প্রকটিত হইয়াই বিশ্বরূপে বিকাশ প্রাপ্ত

হইয়া থাকেন। নাম রূপের উৎপাদক বলিয়াই নাম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এতত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য নহে বলিয়া নিম্নদিক হইতেই প্রতীক বা রূপ অবলম্বনপূর্ব্বক উচ্চস্তরে নামে পৌঁছিবার সাধনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রতীক উপাসনা দ্বারা নামে চিত্তের অভিনিবেশ ঘটিলে স্বরূপের উপলব্ধি হয়। ব্রহ্ম নাম ও রূপের অতীত বলিয়া, একমাত্র প্রণবের অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই তাহাকে উপলব্ধি করা যায় না।

শব্দই যে বিশ্বের মূলে বিদ্যমান, এতত্ত্ব খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলেও স্বীকৃত হইয়াছে; বাইবেলের কথা এই যে, আদিতে একমাত্র শব্দই ছিল; ঐ শব্দ ঈশ্বরের সহিত বিদ্যমান ছিল, এবং ঐ শব্দই ঈশ্বরের স্বরূপ। যথা—"In the beginning there was Word, and the Word was with God, and the Word was God." আর্য্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত এই উক্তির একমাত্র পার্থক্য এই যে, বাইবেলে শব্দকেই ঈশ্বর বলা হইয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রমতে শব্দ ঈশ্বর নহে, উহা ঈশ্বর এই শব্দের যিনি বাচ্য বা লক্ষ্যীভূত, তিনি নিশ্চয়ই শব্দাতীত সৎস্বরূপ মাত্র; সুতরাং তাঁহাকে শব্দ বলা প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞার পরিচায়ক নহে। শাস্ত্রমতে তিনি অশব্দ বা নিঃশব্দ; যথা—'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি—শ্রুতি; এবং

"অগোচরং তথাগম্য রূপনামাদিবর্জ্জিতম্।
নিঃশব্দন্ত বিজানীয়াৎ স ভাবো ব্রহ্ম, পার্ব্বতি॥ (গুরুগীতা)

চতুর্ব্বেদের মহাবাক্য—

চতুর্ব্বেদের চরম সিদ্ধান্ত মহাবাক্য-চতুষ্টয়ে জীব ও ব্রহ্মের অভেদভাবই নির্ণীত হইয়াছে। সেই মহাবাক্য-চতুষ্টয় এই,—সামবেদের "তত্ত্বমসি", যজুর্ব্বেদের "অহং ব্রহ্মাস্মি" ঋগ্বেদের "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", এবং অথর্ব্ববেদের 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। জীব ও ব্রহ্মের এই অভেদ তত্ত্বই উপনিষদের প্রতিপাদ্য; তাই কৈবল্য উপনিষদের শ্রুতি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন,—

> "যৎ পরংব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
> সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ॥"

—যিনি মহতোঽপি মহীয়ান্ সর্ব্বাত্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভিত্তিস্বরূপ পরংব্রহ্ম, এবং যিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর নিত্যবস্তু, তাহাই তুমি এবং তুমিই তাহা। শব্দব্রহ্ম বা প্রণবে অভিনিবেশের ফলে, এই অদ্বৈত তত্ত্বই সাধক উপলব্ধি করিয়া থাকেন; এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি"। আশা করি, এই আলোচনা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয় বিভাবই অবলম্বন করা আবশ্যক, এবং ইহার কোনটাই পরিহার্য্য নহে।

মধ্যম প্রস্থান—দর্শনশাস্ত্র

বেদান্তের প্রথম প্রস্থানরূপ উপনিষদ্‌সমূহের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয় বিভাবই

নিঃশ্রেয়স-লাভের হেতুভূত হইলেও, পরবর্ত্তী কালে কতিপয় দার্শনিক ব্রহ্মের সবিশেষ বিভাবকে স্থূল জ্ঞানের সিদ্ধান্ত মনে করিয়া, নির্ব্বিশেষ বিভাবই যে ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ এই তত্ত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান হইয়াছেন। মহর্ষি কপিলের সাংখ্যদর্শনে এবং বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে এই মতই সমর্থিত হইয়াছে। ইহার বহু পরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যে বা বেদান্তদর্শনে বহুবিধ যুক্তিদ্বারা এই মত পোষণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে, গৌতম ন্যায়দর্শনে, কণাদ বৈশেষিকদর্শনে এবং জৈমিনী মীমাংসাদর্শনে সবিশেষ বিভাবই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মের এই উভয় বিভাবের কোন্‌টী যথার্থ, তাহা নিয়া এই যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাই বেদান্তের মধ্যম প্রস্থান বলিয়া নির্ণীত হইতে পারে; কারণ এব্যাপারে বেদান্তের প্রথম প্রস্থান উপনিষদের উভয়-প্রকার নির্দ্দেশ মধ্যে একতরের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের চেষ্টা চলিয়াছিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ বিভাবাত্মক দুইপ্রকার শ্রুতিই আছে; তথাপি তিনি নির্ব্বিশেষ বিভাবই সমর্থন করিয়াছেন! ব্রহ্মের দ্বিবিধ বিভাব সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি এইরূপ,—

"দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে নামরূপভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতম্। সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। সর্ব্বকর্ম্মা

সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ অস্থূলমনণু অহ্রস্বমদীর্ঘমিত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ ।”

—ব্রহ্মের দুই রূপের বিষয়ই অবগত হওয়া যায়,—একটী নামরূপভেদে উপাধিবিশিষ্ট, অপরটী তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—সকল উপাধিবিরহিত। ব্রহ্মবিষয়ে এই দ্বিবিধরূপাত্মক শ্রুতিই বিদ্যমান আছে; তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদিরূপে সবিশেষ বিভাবসম্পন্ন, এবং অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ ইত্যাদিরূপে নির্ব্বিশেষ বিভাবসমন্বিত। শ্রুতির সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয় বিভাবই স্বীকার করিয়াও শ্রীমদাচার্য্যদেব একতর শ্রুতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক অন্যতর শ্রুতির ভাব সমর্থন করিলেন কিরূপে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক, এবিষয়ের আলোচনাস্থল ইহা নহে।

বেদান্তের প্রথম প্রস্থান বা উপনিষদ্‌সমূহে ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ বিভাবের সহিত জগতের সম্বন্ধও দ্বিবিধরূপেই নির্ণীত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষ বিভাবের সহিত জগতের সম্বন্ধনির্ণয়কালে উপনিষদ্ জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়াছেন। এই মতে ব্রহ্মই জগদ্রূপে ভাণ হইয়া থাকেন; ভাণ কথার তাৎপর্য্য এই যে, স্বরূপতঃ জগতের কোন অস্তিত্ব না থাকিলেও, মনে হয় যেন উহা আছে। রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং শুক্তিতে রজতভ্রম, এই ভাণের দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শিত হয়; রজ্জুতে ভ্রান্তিবশে সর্পবোধ জন্মিলেও, উহাতে যেমন সর্পের অস্তিত্ব থাকে না, শুক্তিতে রজতজ্ঞান হইলেও তথায় যেমন রজতের অভাবই যথার্থ,

তেমন ব্রহ্মেও এই জগতের ভ্রম হইয়া থাকে। রজ্জু বা শুক্তির স্বরূপ অবগত হইতে পারিলেই উহাতে সর্প বা রজতবোধ যেমন আপনা হইতেই অপগত হয়, তেমন ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেই জগদ্বোধ বিলীন হইয়া যায়, এবং তখন একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য সত্যরূপে প্রতিভাত হ'ন। সুতরাং এই চরাচর বিশ্বের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা মানবের প্রতীতিমাত্র। অন্ধকারেই যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি জন্মে, তেমন অবিদ্যা বা অজ্ঞানমূলেই জগদ্ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে; আলোকের সহায়তায় রজ্জুতে সর্পবোধ বিলয়ের ন্যায় জ্ঞানোদয়ে জগদ্বোধও তিরোহিত হয়। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি", "যত্র অন্যদিব স্যাৎ", "য ইহ নানা ইব পশ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে এই সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে; এখানে "ইব" কথার অর্থ এই যে, স্বরূপতঃ "দ্বৈত", "অন্য", "নানা" না থাকিলেও, অজ্ঞতাবশতঃ দ্বৈতের মত, অন্যের মত বা নানার মত প্রতীতি জন্মে। এসম্বন্ধে শ্রুতির নির্দ্দেশ এই যে, এবম্বিধ ভেদজ্ঞানের ফলেই মানব পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে; যথা—

> "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ।
> মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥
> মনসৈবেদমাপ্তব্যমেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
> মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥" (কঠ)

—এই বিকাশমান বিশ্বে ব্রহ্মের যেরূপ সত্তা অনুভূত হয়, বিশ্বের অতীত অবস্থায়ও ব্রহ্ম তদ্রূপই, এবং সেখানে তিনি

যেরূপ এখানেও তেমন ; যে এখানে তাঁহার মধ্যে ভেদ দর্শন করে, সে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। বিশুদ্ধ মন দ্বারাই সেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় ; এখানে ব্রহ্ম ব্যতীত তদতিরিক্ত আর কিছুই নাই। যে এখানে ব্রহ্মের বিবিধ-প্রকার ভেদ দর্শন করে, সে চিরদিন জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অবশ্যই, সবিশেষ বিভাবেও সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয় ; সুতরাং তাহাতে বস্তুর ভেদ লোপ পাইয়া এক ব্রহ্মসত্তাই অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ বিভাবে বস্তুর সত্তাই স্বীকৃত হয় না ; বাহ্যবিকাশ মনের প্রতীতিমাত্র, স্বরূপতঃ তাহা মিথ্যা। কাযেই এই মতে জগতের কোনই অস্তিত্ব নাই।

ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, মহর্ষি উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুর প্রশ্নের উত্তরে একথা অন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। শ্বেতকেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,— "ভগবন্ ! সেই আদেশ কি, যদ্দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এবং অমত বিষয় মতবৎ ও অপরিজ্ঞাত তত্ত্ব পরিজ্ঞাতবৎ উপলব্ধি হয়।" ইহার উত্তরে মহর্ষি উদ্দালক বলিয়াছেন,—

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্। যথা সোম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ

বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কার্ষ্ণায়সমিত্যেব সত্যমেবং সৌম্য স আদেশো ভবতীতি।”

—হে সৌম্য! যেমন একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে ঘট-শরাবাদি সমস্ত মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তুই জানা গিয়া থাকে, কারণ তাহারা মৃত্তিকারই বিকার, বাক্যের যোজনা নামমাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য; যেমন একখণ্ড স্বর্ণকে জানিলে, বলয়-কুণ্ডলাদি সমস্ত স্বর্ণনির্ম্মিত বস্তুই জানা যাইতে পারে, কারণ তাহারা স্বর্ণেরই বিকার, বাক্যের যোজনা নামমাত্র, স্বর্ণ ইহাই সত্য; যেমন একটী লৌহনির্ম্মিত নরুণকে জানিলে দাঁ, কাস্তে প্রভৃতি সমস্ত লোহার জিনিষই জ্ঞাত হওয়া যায়, কারণ তাহারা লৌহেরই বিকার, বাক্যের যোজনা নামমাত্র, লৌহ ইহাই সত্য; হে সৌম্য! এই আদেশও তদ্রূপই। উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, ঘট-শরাবাদি মৃণ্ময় বস্তু, বলয়-কুণ্ডলাদি স্বর্ণনির্ম্মিত দ্রব্য, এবং দাঁ, কাচি প্রভৃতি লোহার জিনিষ বাহ্যদৃষ্টিতে বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, স্বরূপতঃ সে সমস্তই যেমন একমাত্র মৃত্তিকা, স্বর্ণ বা লৌহ ব্যতীত অপর কিছুই নহে, ঐ সকল কেবল নাম-রূপের যোজনামাত্র, কারণ ঘটাদি ভাঙ্গিলেই উহাদের নাম-রূপও অন্তর্হিত হইয়া থাকে, তেমন এই জগতের বিভিন্নরূপে বিকাশও এক ব্রহ্মেরই বিকার বা বিবর্ত্তন মাত্র। স্বরূপতঃ জগৎ অসৎ বা মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এই যুক্তিই সর্ব্বথা সমীচীন মনে করিয়া দ্বিতীয় প্রস্থানের একদল বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ব্রহ্মের সবিশেষ

বিভাব সমর্থনযোগ্য নহে, নির্ব্বিশেষ বিভাবই ব্রহ্মের স্বরূপ।

ব্রহ্মের সবিশেষ বিভাবের সহিত জগতের সম্বন্ধ নির্ণয়কালে উপনিষদ্ বিশ্বের বিভিন্ন পদার্থসমূহ ব্রহ্ম হইতেই বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের শ্রুতি এইরূপ,—

"স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেব-মেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।"

—যেমন ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) হইতে তন্তুজাল নিঃসৃত হয়, অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গসমূহ বহির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই আত্মা হইতেই সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, দেবতাসকল এবং নিখিল ভূতনিবহ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। মুণ্ডক উপনিষদের শ্রুতিতেও এই ঊর্ণনাভি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ততো আছেই; অধিকন্তু তাহাতে পুরুষের দেহে যেমন কেশ-লোমাদি আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং পৃথিবীতে যেমন ওষধিসকল জন্মিয়া থাকে, সেই দৃষ্টান্ত দ্বারাও অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের বিকাশ প্রতিপাদিত হইয়াছে; যথা—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্। তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥"

—যেমন উর্ণনাভি স্বীয় শরীর হইতে তন্তুসমূহ বাহির করে, এবং পরে আবার তাহা নিজ শরীরমধ্যেই প্রতিসংহৃত করিয়া থাকে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি সকল জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষের শরীর হইতে কেশ-লোমাদি উৎপন্ন হয়, ঠিক সেই ভাবেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, সুদীপ্ত অগ্নি হইতে অগ্নিরই অনুরূপ বহুসংখক বিস্ফুলিঙ্গবিকাশের ন্যায় এই অক্ষর পুরুষ হইতে তাহারই প্রতিরূপ নানাবিধ দেহোপাধিবিশিষ্ট জীবসকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে, এবং পরিণামে তাহাতেই আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে।

তৈত্তিরীয় উপনিষদের শ্রুতিতে এতত্ত্ব আরও স্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত আছে; যথা—

"এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষি ইত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎ কিঞ্চ প্রাণিজঙ্গমঞ্চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।"

এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সমস্ত দেবতা, এই পঞ্চমহাভূত, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই সকল ক্ষুদ্র মিশ্র বীজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, জীব, অশ্ব, গো, পুরুষ, হস্তী প্রভৃতি যাহা কিছু, জঙ্গম প্রাণী, পক্ষী, স্থাবর

সমস্তই ব্রহ্ম। সকলই প্রজ্ঞানেত্র ও প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; সমস্ত লোকই প্রজ্ঞানেত্র, প্রজ্ঞাই সকলের প্রতিষ্ঠা এবং প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। এজন্যই ছান্দোগ্য উপনিষদের শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্"—এই সমস্তই যে ব্রহ্ম তাহাতে সংশয় নাই; কারণ সমস্তই ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত, এবং অন্তে ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্ম"—এই শ্রুতিতেও এতত্ত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্থানের পতঞ্জলিপ্রমুখ দার্শনিকগণ ব্রহ্ম ও জগতের এ সম্বন্ধই যথার্থ বিবেচনা করিয়া ব্রহ্মের সবিশেষ বিভাব সমর্থন এবং নির্ব্বিশেষ বিভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মের উভয় বিভাব সম্বন্ধে মধ্যম প্রস্থানে দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তের বিভিন্নতা নিবন্ধন সাধনপ্রণালীতেও মতদ্বৈধ ঘটিয়াছিল। নির্ব্বিশেষ বিভাবের সমর্থকগণ একমাত্র জ্ঞানমার্গের অনুসরণই আবশ্যক মনে করিয়াছেন, এবং সেজন্য তাঁহারা বৈরাগ্য বা সংসারত্যাগের বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন; তাঁহাদের মতে সংসারের ভোগাদি সমস্ত পরিহার করিয়া একান্তে অবস্থানপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলেই নিঃশ্রেয়সলাভ হইবে। কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগ প্রভৃতি নিঃশ্রেয়সলাভের হেতুভূত নহে। পক্ষান্তরে, সবিশেষ বিভাবের সমর্থনকারী দার্শনিকগণের মতে কর্ম্ম, ভক্তি ও যোগাদি সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই শ্রীভগবানের কৃপায় সাধক জন্ম-মৃত্যুর প্রভাব হইতে

চিরতরে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিত্যানন্দভোগের অধিকারী হইয়া থাকে। নির্ব্বিশেষ বিভাবের সমর্থকগণ অদ্বৈতবাদী, এবং সবিশেষ বিভাবের সাধকবর্গ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মে জীবের বিলয় হয়; দ্বৈতবাদে জীব ব্রহ্মের সহিত চিরদিন ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদিগণ পরস্পরের লক্ষ্য ও সাধনপ্রণালীর প্রতি দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হ'ন নাই; কাযেই এ বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে।

চরম প্রস্থান—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মধ্যম প্রস্থানের দার্শনিকগণ ব্রহ্মের বিভাবদ্বয় লইয়া যে বাদানুবাদের তরঙ্গ তুলিয়াছিলেন, এবং তৎফলে সাধনপ্রণালীতে যে সমস্যার সমুদ্ভব হইয়াছিল, তাহার সমন্বয়-সাধনপূর্ব্বক শান্তি-সংস্থাপনেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সার্থকতা। বেদান্তের বিবাদ-নিরসন দ্বারা জীবের চরম কল্যাণসাধনের নিমিত্তই সম্ভবতঃ গীতা বেদান্তের চরম প্রস্থান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা অনুসরণপূর্ব্বক শ্রীভগবান গীতায় সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয় বিভাবই সম্মিলিতরূপে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্ধারণ করতঃ নির্ব্বাণলাভের নিমিত্ত কর্ম্ম, যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান সকলেরই সমান প্রয়োজন প্রতিপাদন করিয়াছেন। গীতার মতে জ্ঞানের সাহায্যে বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি-

সহকারে নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সম্পাদনরূপ কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলেই সাধক তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানে প্রবেশপূর্ব্বক চিরশান্তিলাভে সমর্থ হয়। গীতার উপসংহাররূপে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫১—৫৬ শ্লোকে এতত্ত্বই বিবৃত হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই যে অব্যয় হইয়াও ঈশ্বররূপে লোকত্রয়ে প্রবেশপূর্ব্বক সকলকে পালন করিতেছেন, গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে তাহা স্পষ্টভাবেই পরিব্যক্ত আছে ; যথা—

"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিবর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"

সুতরাং নির্ব্বিশেষ যে সবিশেষ হইতে স্বতন্ত্র নহেন, নির্ব্বিশেষই যে সবিশেষ বিভাবে ঈশ্বর হইয়াছেন, শ্রীভগবান সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর রাখেন নাই। গীতায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সকল শ্লোক আছে, তাহাতে একসঙ্গে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ বিভাবের উল্লেখই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব একথা অবাধেই বলা যাইতে পারে যে, গীতার বক্তা নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ এই উভয় বিভাবই একসঙ্গে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে একমাত্র নির্ব্বিশেষ বিভাবাত্মক অক্ষরব্রহ্মের বিষয় বর্ণনকালেও ভগবান তাহাতে সবিশেষ বিভাবের সংযোগ প্রয়োজন মনে করিয়াছেন ; যথা—

"যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥"

এখানে অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব পদসমূহ নির্ব্বিশেষ অক্ষরব্রহ্মের পরিচায়ক হইলেও, সর্ব্বত্রগ পদে সবিশেষ বা সগুণ বিভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে; কারণ নির্ব্বিশেষ বা নির্গুণ ব্রহ্ম কখনই সর্ব্বত্রগ হইতে পারেন না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১৩—১৮ শ্লোকে ভগবান জ্ঞেয় পদার্থরূপে ব্রহ্মের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয় বিভাবই যে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই বর্ণনা স্থিরভাবে পাঠ করিলে কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। উক্ত শ্লোক কয়টী এইরূপ,—

"জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্ব্বতঃপাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥"

তার পর, এই ত্রয়োদশ অধ্যায়েরই ২৩ শ্লোকে ভগবান পরমাত্মার স্বরূপবর্ণনায় যেমন তাঁহাকে পর পুরুষ (দেহাতীত স্বতন্ত্র পুরুষ) ও উপদ্রষ্টা (দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র) বলিয়াছেন, তেমন তিনি যে অনুমন্তা (অনুগ্রাহক), ভর্ত্তা (ভরণ বা ধারণ-কর্ত্তা), ভোক্তা (বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত বিষয়ের উপলব্ধিকারক) এবং মহেশ্বর (ব্রহ্মাদি জগৎকর্ত্তাদিগেরও অধিপতি), তাহাও বলিতে তিনি বিরত রহেন নাই। যথা—

"উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥"

এই শ্লোকে বর্ণিত পরমাত্মায় যে নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষরূপ উভয় বিভাবই বিদ্যমান, তাহা সহজবোধ্য। সুতরাং গীতার মতে সবিশেষ বা সগুণ, এবং নির্ব্বিশেষ বা নিগুণ এই উভয় বিভাবই যে সম্মিলিতরূপে ব্রহ্মসত্তার প্রতিপাদক, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ বা সগুণ ঈশ্বররূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াই নিবৃত্ত রহেন নাই; তিনি সৃষ্ট জগতে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ঘটিলে, সংসারের স্থিতিরক্ষার্থ সজ্জনবর্গের সংরক্ষণ, দুর্জ্জনগণের নিধনসাধন এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে যে ধরাধামে অবতীর্ণও হইয়া থাকেন, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৬—৯ শ্লোকে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। সে সমস্ত দিব্য হইলেও, তাঁহার জন্ম এবং কর্ম্মের কথা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন; যথা—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥"

এখানে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, তিনি অজ এবং অব্যয়াত্মা অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ হইয়াও, ভূতসমূহের ঈশ্বর বা নিয়ন্তা অর্থাৎ সবিশেষ বিভাবসম্পন্ন। তার পর, নিজ মায়া অবলম্বনে তিনি সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া নানারূপ কর্ম্মও করিয়া থাকেন। দিব্য হইলেও তাহা যে লৌকিক ব্যাপারেরই অনুরূপ, উদ্ধৃত শেষ শ্লোকস্থিত জন্ম ও কর্ম্ম পদ দ্বারা তাহা অবিসম্বাদিতরূপেই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। এখানে ভগবান কেবল সময় সময় তাঁহার মানবরূপে আবির্ভাবের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু ১৫শ অধ্যায়ে ১৬—১৮ শ্লোকে যে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তমরূপে ত্রিবিধ পুরুষের কথা আছে, তাহাতে অক্ষর পুরুষের ন্যায় ক্ষর পুরুষ বা ভূতসকলও যে তিনিই তাহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। ১৮ শ্লোকে যে ভগবান আপনাকে ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম বলিয়াছেন, উহা তাঁহার নির্ব্বিশেষ বিভাবের কথা; কিন্তু তাঁহার এই উত্তম বা চরমাবস্থাও যেমন পুরুষ-পদবাচ্য, তেমন মধ্যম অক্ষর ও অধম ক্ষরাবস্থাও যখন পুরুষ পদ

দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন এই উভয়ও যে তাঁহারই বিভিন্ন অবস্থা, সেকথা অস্বীকার করার উপায় কোথায়? ধীরভাবে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটী পড়িয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, এখানে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ও জীবরূপে পরমপুরুষের ত্রিবিধ অবস্থাই বিবৃত হইয়াছে। যথা—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিত পুরুষোত্তমম্॥"

গীতায় এই যে উত্তম, অক্ষর ও ক্ষরপুরুষরূপে ব্রহ্মের ত্রিবিধ বিভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উপনিষদের নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ বিভাবেরই অন্তর্ভূত। গীতার উত্তম পুরুষ উপনিষদের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অক্ষর ও ক্ষর পুরুষ সবিশেষ ব্রহ্ম; অক্ষর পুরুষ ত্রিগুণের অধিনায়ক সৃষ্টিকর্ত্তা সমষ্টিস্বরূপ ঈশ্বর, এবং ক্ষরপুরুষ ত্রিগুণাধীন ব্যষ্টিস্বরূপ সৃষ্ট জগৎ। ব্যষ্টির সমবায়ই সমষ্টি বলিয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টিতে স্বরূপতঃ ভেদ নাই; সুতরাং ক্ষরপুরুষ অক্ষরেরই অন্তর্ভূত, এবং অক্ষরই ক্ষররূপে অভিব্যক্ত। এ অবস্থায় উপনিষদের সবিশেষ বিভাবই যে গীতায় অক্ষর ও ক্ষররূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেকথা সম্ভবতঃ সকলেই স্বীকার করিবেন। অবিদ্যা বা মায়ার সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়াই ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ বিভাব নির্ণীত হইয়াছে; উত্তমপুরুষ মায়াতীত নির্গুণ ব্রহ্ম, অক্ষরপুরুষ মায়াধীশ সগুণ ব্রহ্ম, এবং ক্ষরপুরুষ

মায়াধীন জীব বা জগৎ ব্রহ্ম। মায়াধীন পুরুষ যদি মায়াতীত হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে মায়াধীশের অনুগ্রহ আবশ্যক; যে মায়াধীন সে যদি মায়াকে আপনার অধীনে আনিতে পারে, তাহা হইলেই মায়ার প্রভাব অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়া থাকে; সুতরাং মায়াধীনের যে সর্ব্বপ্রযত্নে মায়াধীশের শরণ-গ্রহণ প্রয়োজন, সেকথা সহজবোধ্য। এজন্যই সপ্তম অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

—আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়া অতীব দুরতিক্রম্যা; যাহারা আমাকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল জানিয়া আমার শরণাগত হয়, তাহারাই কেবল এই মায়া হইতে পরিত্রাণ পায়। এ জন্যই শ্রীভগবান গীতায় মায়াধীন জীবের জন্য মায়াতীত বা নির্ব্বিশেষ বিভাবের কথা বিশেষ না বলিয়া, সবিশেষ বিভাবের বিষয়ই বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন, এবং এই সবিশেষ বিভাবের শরণাগত হইবার নিমিত্তই অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। যথা—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

(নবম অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

হে কৌন্তেয়! তুমি যে কোন কর্ম্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যজ্ঞ দান ও তপস্যাদি যাহাই অনুষ্ঠান কর, সেই সমস্তই

আমাতে অর্পণ করিও;—অর্থাৎ শ্রীভগবানের পদে জীবের সর্ব্ববিধ কর্ম্মই সমর্পণ করিতে হইবে। গীতার উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৪—৬৬ শ্লোকে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে ধর্ম্মের সর্ব্বগুহ্যতম তত্ত্বরূপে তদ্গতচিত্ত, তদ্ভক্ত, তদ্‌যাজী ও তাঁহারই চরণে প্রণতঃ হইয়া অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্মাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র তাঁহার শরণাগত হওয়ার নিমিত্তই উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, তদ্রূপ করিলেই যে তাঁহাকে লাভ করা যাইবে, সে-বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গীতায় শ্রীভগবানের সেই মহাবাক্য গীতাপাঠক-মাত্রেরই চিত্তে সতত প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে; যথা—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

এখানে ভগবান যে সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মভাবেই নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, সেবিষয়ে সন্দেহের অণুমাত্রও অবসর নাই। এই শ্লোকের মে, মৎ, মাং, অহং প্রভৃতি পদ যে ভগবানের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক ও কর্তৃত্বেরই পরিচায়ক, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান তাঁহার বিভূতিবর্ণনকালে প্রথমেই বলিয়াছেন,—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"

—হে অর্জ্জুন! আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা, এবং ভূতসমূহের আদি, মধ্য, অন্তও আমি। ভাব এই যে, আমি কেবল ভূতসমূহের আত্মাই নহি, তাহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ভূতত্বজ্ঞাপক তাহার সমস্তই আমি। ইহার পর, ভগবান বিষ্ণু, সূর্য্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিগ্রহরূপে যে তিনিই বিদ্যমান, তাহা বর্ণনপূর্ব্বক বলিয়াছেন,—

"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥"

—সর্ব্বভূতের উৎপত্তির হেতুভূত বীজও আমিই, এবং চর ও অচর ভূতসমূহের মধ্যে আমাকে ব্যতীত কোন ভূতই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। অবশেষে দশম অধ্যায়ের উপসংহারে ভগবান কহিতেছেন,—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

—অর্জ্জুন! আমি ইহা, আমি উহা, এত সব জানিয়া তোমার কি লাভ? তুমি ইহাই জানিয়া রাখ যে, আমি আমার একাংশ দ্বারাই এই সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি। এই ভগবদুক্তি হইতে অবিসম্বাদিতরূপেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তদতিরিক্ত বা তাঁহার অনাশ্রিত কিছুতো নাই-ই, বিশ্বের বাহিরেও তাঁহার বিরাট সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভগবান কেবল বিশ্বমূর্ত্তি বা বিশ্বানুগ নহেন; বিশ্বের বাহিরেও তাঁহার বিরাট সত্তার বিদ্যমানতা নিবন্ধন তিনি বিশ্বাতিগও বটেন। এই শ্লোক পুরুষ-সূক্তান্তর্গত নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্যেরই প্রতিধ্বনিস্বরূপ, —"পাদোঽস্য সর্ব্বাভূতানি ত্রিপাদোঽস্যামৃতং দিবীতি।"—ইহার একপাদে মাত্র সমগ্র বিশ্ব বিদ্যমান, অপর ত্রিপাদ অমৃতময় দ্যুলোকে অবস্থিত। দশম অধ্যায়ে ভগবান তাঁহার বিভূতি যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, একাদশ অধ্যায়ে তাহাই অর্জ্জুনের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে; সুতরাং গীতার মতে একই পুরুষ যেমন নির্ব্বিশেষ বা নির্গুণ, তেমন সবিশেষ বা সগুণতো বটেনই, তিনি বিশ্বরূপেও বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩০।৩১ শ্লোকেও এতত্ত্বই সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে; যথা—

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

—যিনি সমস্ত প্রপঞ্চে সর্ব্বস্বরূপ আমাকে দর্শন করেন, এবং আমার মধ্যেই সমস্ত প্রপঞ্চের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, আমি কখনও তাঁহার পরোক্ষ হই না, এবং তিনিও আমার পরোক্ষ হ'ন না। যে যোগীপুরুষ সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে (তৎপদবাচ্য পুরুষকে) আপনার (ত্বং পদবাচ্য জীবের) সহিত অভিন্নরূপে অবধারণপূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি

সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও আমাতেই অভেদভাবে বর্ত্তমান রহেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকেও এ কথাই আছে, —

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

—বিনাশ-শীল সমগ্র ভূতগ্রামের মধ্যে যিনি অবিনাশী পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তিনিই যথার্থদর্শী।

গীতার মতে ভগবান প্রতিকল্পে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন,—"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ"; (৯ম অধ্যায়, ৮ম শ্লোক)। তাঁহার কর্ত্তৃত্বেই প্রকৃতি চরাচর প্রসব করে,— "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"; (৯ম অধ্যায়, ১০ম শ্লোক)। সৃষ্টির নিমিত্ত ভগবান্ মহদ্ব্রহ্ম বা প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন, এবং তৎফলেই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে; সমস্ত যোনিতে যেসকল শরীর উৎপন্ন হয়, মহদ্-ব্রহ্মই তাহাদের যোনিস্বরূপ, এবং ভগবানই বীজপ্রদ পিতা,—

"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥
(১৪শ অধ্যায়, ৩।৪ শ্লোক)

ভগবান কেবল ভূতসমূহের সৃষ্টিকর্ত্তা বা ভূতভাবন নহেন, ভূতসমূহের পালক বা ভূতভৃৎ-ও তিনিই, এবং তিনিই ভূত-সকলের সংহারকর্ত্তাও বটেন,—"ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা

ভূতভাবনঃ", (৯ম অধ্যায়, ৫ম শ্লোক); "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ"; (১১শ অধ্যায় ৩২ শ্লোক)। কেবল ইহাই নহে, তিনি জগতের মাতা, ধাতা, পিতামহ, গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস (আশ্রয়স্থল), শরণ (রক্ষাকর্ত্তা), সুহৃৎ, প্রভব (উৎপত্তির কারণ), প্রলয় (বিনাশের হেতুভূত), স্থান (আধার), নিধান (লয়স্থান), এবং অব্যয় বীজ (অবিনাশি কারণ),—অর্থাৎ তিনি জগতের সমস্তই; যথা—

"পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।"
"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"
(৯ম অধ্যায়, ১৭।১৮ শ্লোক)

গীতার মতে সৃষ্ট জগতের সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ যখন এইরূপ, তখন এবিষয়ে কোনই সন্দেহ উঠিতে পারে না যে, গীতায় উপনিষদের বিবর্ত্তবাদ সমর্থিত হয় নাই, এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" ঐ শ্রুতিবাক্যই সর্ব্বথা অনুসৃত হইয়াছে। সমস্তই ব্রহ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত, তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত, এবং অন্তে তাহাতেই পর্য্যবসিত হয় বলিয়া ভেদ-বুদ্ধি কেবল মাত্র অজ্ঞতাজাত, এবং সেই অজ্ঞানের বিলোপ হইলেই জীব সর্ব্বত্র একমাত্র অদ্বৈত-সত্তার অনুভূতিতে স্ব-স্বরূপে বা ব্রহ্মে অবস্থিত হয়। তাই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥"

—সাধক যখন ভূতসমূহের পৃথক্‌ভাব অস্বীকার করিয়া একমাত্র ব্রহ্মেই সমস্ত অবস্থিত দেখিতে পায়, এবং ব্রহ্ম হইতেই সমস্তের বিকাশ বা বিস্তার উপলব্ধি করিয়া থাকে, তখন সে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়।

এসকল ভগবদুক্তি হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত অবাধেই করা যাইতে পারে যে, গীতায় শ্রীভগবান তাঁহার সবিশেষ বিভাবই বিশেষভাবে সমর্থন করিয়াছেন, এবং সেই সবিশেষ বিভাব অবলম্বনে সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান্ হইতেই উপদেশ দিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন, সবিশেষ ভাবের উপাসক এবং নির্বিবশেষ বিভাবের সাধকগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে? ইহার যে উত্তর ভগবান দিয়াছেন, তাহা হইতে ইহা নিঃসংশয়িতরূপেই প্রমাণিত হয় যে, পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার সবিশেষ স্বরূপের সাধনাই তিনি শ্রেয়ঃকল্প মনে করেন। নির্ব্বিশেষ বিভাবের সাধকগণও তাঁহাকেই প্রাপ্ত হ'ন বটে; কিন্তু সে সম্বন্ধে ভগবদ্বাক্যের বিন্যাস দেখিয়া ইহা বুঝিতে বাকি থাকে না যে, নির্ব্বিশেষ বিভাবের সাধনা অধিকতর ক্লেশকর বলিয়া সুবিধাজনক নহে। নিম্নে এবিষয়ে অর্জ্জুনের প্রশ্ন ও শ্রীভগবানের উত্তর উদ্ধৃত হইতেছে :—

অর্জ্জুন উবাচ।—

"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥"

শ্রীভগবান্ উবাচ।—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।

শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।

সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

(১২শ অধ্যায়, ১—৫ শ্লোক)

এই ভগবদ্বাক্যে "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব" কথার "এব" শব্দ দ্বারা, এবং "ক্লেশোঽধিকতরস্তেযামব্যক্তাসক্তচেতসাম্" কথা দ্বারা নির্ব্বিশেষ বিভাব অপেক্ষা সবিশেষ বিভাবের উপাসনাই শ্রেয়স্কর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু এখানে নির্ব্বিশেষ বিভাবের বর্ণনকালেও ভগবান যে সবিশেষ বিভাবসূচক "সর্ব্বত্রগ" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহারও নিশ্চয়ই নিগূঢ় অর্থ আছে। এই সবিশেষ বিভাবাত্মক পদের প্রয়োগদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, একমাত্র নির্ব্বিশেষ বিভাবের সাধনা অসম্ভব—উপাসনার জন্য নির্ব্বিশেষ বিভাবের সহিতও অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে সবিশেষ বিভাবের সংমিশ্রণ প্রয়োজন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বত্রগরূপে সবিশেষ না হইলে তাহার উপাসকগণ "সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ" হইবেন কিরূপে, এবং তাঁহারা "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ"-ই বা হইবেন

কেন? সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি কেবল **"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি"** হইলেই সম্ভব হয়। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম **"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"** বলিয়া উপাসনার অতীত; কাযেই এখানে অর্জ্জুনের **"পর্য্যুপাসতে"** কথার উত্তরে ভগবান নির্ব্বিশেষ বিভাবের উপাসনার নিমিত্ত সবিশেষ বিভাবের সংযোগ প্রয়োজন মনে করিয়া থাকিবেন। অতএব এখানে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ এই উভয় বিভাবসম্পন্ন হইলেও সাধক সবিশেষ বিভাব অবলম্বন করিয়াই সাধনমার্গে অগ্রসর হইবেন, এবং সেই পথে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই নির্ব্বিশেষ বিভাবে নিমগ্ন হইয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। বেদান্তের মধ্যম প্রস্থানে যে মতভেদ দেখা দিয়াছিল, গীতায় এভাবেই তাহার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, এবং ইহাই বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত। এজন্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদান্তের চরম প্রস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

গীতার সাধনপ্রণালী।

গীতোক্ত সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা বোধ হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেকে মনে করেন, গীতায় শ্রীভগবান বিভিন্ন স্তরের সাধকগণের নিমিত্ত কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানরূপ ত্রিবিধ সাধনপ্রণালীরই উপদেশ দিয়াছেন; যাঁহার যেরূপ অধিকার, তিনি সেই পথে অগ্রসর

হইলেই কৃতকৃত্য হইতে, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিতে পারিবেন। কেহ কেহ একথাও বলিয়া থাকেন যে, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান পর পর সকল সাধনপ্রণালীই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ; কর্ম্মের ফলে ভক্তি ও ভক্তির প্রভাবে জ্ঞানোদয় হইলেই নিঃশ্রেয়স-লাভ সম্ভব হইবে। আবার এমন কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন যে, গীতায় জ্ঞানই মুখ্যসাধনরূপে বিবৃত হইয়াছে ; কারণ জ্ঞানই একমাত্র মোক্ষের হেতুভূত, কর্ম্ম ও ভক্তি নিম্নাধিকারী ব্যক্তিবর্গের জন্যই ব্যবস্থিত। পরবর্ত্তীকালে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যরূপে সম্মানিত গীতার প্রধান ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও গীতাকে জ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্নবান হইয়াছেন। তাই ভাষ্যের মুখবন্ধে তিনি শোক-মোহকেই সংসারপ্রবৃত্তির কারণ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন,—

"তত্রৈবং সতি ধর্ম্মাধর্ম্মোপচয়াৎ ইষ্টানিষ্টজন্মসুখদুঃখপ্রাপ্তিলক্ষণঃ সংসারোঽনুপরতো ভবতীত্যতঃ সংসারবীজভূতৌ শোকমোহৌ। তয়োশ্চ সর্ব্বকর্ম্ম-সংন্যাসপূর্ব্বকাত্মজ্ঞানাৎ নান্যতো নিবৃত্তিরিতি তদুপদিদিক্ষুঃ সর্ব্বলোকানুগ্রহার্থং অর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ—অশোচ্যানিত্যাদি।—

—এই কারণে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বৃদ্ধি পায়, ধর্ম্মের ফল ইষ্ট ও অধর্ম্মের ফল অনিষ্টরূপ কারণ হইতে সুখ ও দুঃখের সম্প্রাপ্তি হয়। এই প্রকার সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তিকেই সংসার কহে। এই প্রকারে সুখ-দুঃখময় সংসার নিবৃত্ত হয় না। এই কারণেই শোক ও মোহ সংসারের নিমিত্ত (রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে) ; সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে সেই সংসার-

নিমিত্ত শোক ও মোহের নিবৃত্তি অন্য কোন উপায় দ্বারা হইতে পারে না। এই কারণে সর্ব্বলোকের অনুগ্রহার্থ সেই আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের উপদেশ করিবার অভিলাষে ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া "অশোচ্যান্" ইত্যাদি শ্লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

এই সকল বিভিন্ন মতপোষণকারী ব্যক্তিবর্গ গীতার ভগবদুক্তি হইতে নিজ নিজ মত সমর্থন করিতে যত্নবান হইলেও, একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, এতগুলি বিভিন্ন মত গীতার সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা কথনই সমীচীন হইতে পারে না। যে শাস্ত্রের বক্তা স্বয়ং শ্রীভগবান এবং শ্রোতা পার্থের মত প্রধান পুরুষ, তাহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে এরূপ মতদ্বৈধ হওয়া স্পৃহনীয় নহে। গীতার উপদেশ অমৃততুল্য দুগ্ধস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; স্বয়ং গোপালনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থরূপ বৎসের সহায়তায় উপনিষদসমূহরূপ গাভীসকল হইতে এই দুগ্ধ দোহন করিয়াছেন। সুধীগণই এই অত্যুৎকৃষ্ট দুগ্ধসেবনের অধিকারী; যথা—

"সর্ব্বোপনিষদোগাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতম্ মহৎ॥"

গাভী সর্ব্বগুণসম্পন্ন না হইলে উৎকৃষ্ট দুগ্ধ পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে না, এবং দোহনকারী যদি বিশেষ কার্য্যকুশল ও বৎসটী উত্তম না হয় তাহা হইলেও, যথেষ্ট দুগ্ধলাভ

সম্ভবপর নহে। সেজন্য এই গীতামৃতরূপ দুগ্ধের গাভী হইতেছে শাস্ত্রের শিরোমণি উপনিষদ্‌সমূহ, দোহনকারী গোয়ালার কুল-প্রদীপ শ্রীকৃষ্ণ এবং বৎস পার্থের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত নরনারায়ণের নরাবতার পুরুষ; কাযেই গীতারূপ দুগ্ধ যে অমৃততুল্য সেবিষয়ে সংশয়ের অবসর নাই। যাহার মহিমা এরূপ মহনীয়, তাহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংশয় উঠিলে বস্তুতঃই বিস্মিত হইতে হয়। বেদান্তের প্রথম, মধ্যম ও চরম প্রস্থান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা করা গিয়াছে, তাহা হইতে সম্ভবতঃ সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গীতায় যেমন ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল মতের সমন্বয়-সাধনপূর্ব্বক এক নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তেমন জীবের পরমপুরুষার্থ বা নিঃশ্রেয়স-লাভের নিমিত্ত নিশ্চয়ই এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীও নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিবে। সেই প্রণালী কি তাহাই আলোচ্য।

গীতার শেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন, একথা সম্ভবতঃ সকলেই স্বীকার করিবেন; সুতরাং গ্রন্থের সিদ্ধান্ত যে এই অষ্টাদশ অধ্যায়েই নিবদ্ধ আছে, একথা অবাধেই বলা যাইতে পারে। প্রকৃতিগত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধিলাভই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়, স্থিরচিত্তে গীতা পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। গীতার সেই মহাবাক্য,—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

সততই গীতাপাঠার্থীর চিত্তে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। অর্জ্জুন যে কারণে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে চহিয়াছিলেন, তাহা যে অতিশয় অযৌক্তিক বা অসঙ্গত, এমন কথা বলা চলে না; তথাপি এভাবে যুদ্ধত্যাগ অর্জ্জুনের ক্ষাত্রপ্রকৃতির অনুরূপ বা অনুকূল নহে বলিয়াই শ্রীভগবান গীতার অমূল্য উপদেশ-রাজি দ্বারা তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধ না করিয়া অর্জ্জুন কিছুতেই নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবেন না, একথা বুঝাইবার জন্যই অবশেষে ভগবান দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন,—

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

(১৮ শ অধ্যায়, ৫৯।৬০ শ্লোক)

—অর্জ্জুন! তুমি অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া 'যুদ্ধ করিব না' বলিয়া যে মনে করিতেছ, তোমার ঐরূপ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা; কারণ প্রকৃতি তোমাকে ঐরূপ কার্য্যে নিশ্চয়ই নিযুক্ত করিবে। হে কৌন্তেয়! মোহবশতঃ তুমি এখন যে যুদ্ধ করিতে চাহিতেছ না, স্বভাবসিদ্ধ ক্ষাত্রপ্রকৃতির অনুকূল কর্ম্মগতিতে আবদ্ধ থাকাতে তুমি অবশের ন্যায় তাহা করিতে বাধ্য হইবে। স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিলে গীতার প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ উপদেশের আভাষ পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের

৪১—৪৪ শ্লোকে ভগবান এই প্রকৃতিগত ধর্ম্মেরই বিশ্লেষণ করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিলে কিরূপে নিঃশ্রেয়সলাভ হয়, সেকথা গীতার চরম সিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উল্লিখিত ৪১—৪৪ শ্লোকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— এই বর্ণচতুষ্টয়ের কার্য্যকলাপ যে স্বাভাবিক গুণপ্রভাবেই বিভিন্নভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে, তাহা বর্ণন করিয়া ভগবান বর্ণসকলের ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক কর্ম্ম বা ধর্ম্মের কথা প্রচার করিয়াছেন, এবং তৎপর ৪৫ শ্লোকে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন,— **"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ"**—মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মে নিরত থাকিলেই সম্যক্ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। এখানে "সংসিদ্ধি" পদের অর্থ সম্পূর্ণ বা চরম সিদ্ধি অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তি। সাধারণ সিদ্ধি যদি বক্তার অভিপ্রেত হইত তাহা হইলে, তিনি কখনই সিদ্ধি শব্দের সহিত সং (অর্থাৎ—সম্যক্) উপসর্গ যোগ করিতেন না। সুতরাং নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানেই যে চরম সিদ্ধি বা নিশ্রেয়সলাভ হইয়া থাকে, ভগবদ্বাক্যে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। তৃতীয় অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকেও ভগবান স্পষ্ট ভাষাতে একথাই বলিয়াছেন; যথা—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরণ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥"

—অতএব তুমি অনাসক্তভাবে সর্ব্বদা কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত থাক; কারণ অনাসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই মানব

পরমপদ বা মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। অনাসক্তভাবে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই গীতার মূলসূত্র।

স্বকর্ম্মে অর্থাৎ নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিলে কিরূপে সিদ্ধিলাভ ঘটে, অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে সে তত্ত্ব নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত হইয়াছে,—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

—যে প্রবৃত্তিমূলে ভূতসমূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, যাঁহা হইতে সেই প্রবৃত্তি আবির্ভূত হয়, এবং যিনি সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া বিদ্যমান, মানুষ নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়াই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। কর্ম্মমাত্রই প্রবৃত্তিমূলে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জীবের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, জীবের প্রবৃত্তির উৎপাদকও যে তিনিই, একথা বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না; সুতরাং ভগবদিচ্ছায়ই যে মানবগণ প্রবৃত্তিমূলে কর্ম্ম করিয়া থাকে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। কর্ম্মমাত্রই যখন ভগবদিচ্ছায় সম্পন্ন হয়, তখন এরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে ভগবানের প্রীত হওয়াই স্বাভাবিক। কাযেই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় ভগবদিচ্ছায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা যে তাঁহারই অর্চ্চনা হয়, সেবিষয়ে সংশয়ের অবসর কোথায়? অবশ্য প্রবৃত্তির অনুকূল কার্য্য সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য; মানুষ অহঙ্কারের উন্মাদনায় যেসকল কার্য্য করিয়া

থাকে, তাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়াতে ঐরূপ কার্য্য সম্বন্ধে একথা খাটে না। কর্ম্মের যিনি প্রবর্ত্তক, কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহারই তৃপ্তিলাভ হইতে পারে; সুতরাং মানুষ ভগবদিচ্ছার অধীন থাকিলেই তাহার কর্ম্মে ভগবানের অর্চ্চনা হয়। পরবর্ত্তী ৪৭ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যাহার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম যেরূপ, তাহা যদি অপরের প্রকৃতির অনুরূপ ধর্ম্ম অপেক্ষা অপকৃষ্টও হয় তাহা হইলেও, নিজ ধর্ম্মই সে ব্যক্তির পক্ষে শ্রেয়স্কর। সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম কাহারও পক্ষে কল্যাণজনক নহে। কাযেই পরধর্ম্মের তুলনায় নিজ ধর্ম্ম হেয় হইলেও, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্মগ্রহণ কখনও গীতার অনুমোদিত নহে। স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানে বা স্বধর্ম্মাচরণে কোনরূপ পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত; যথা—**"স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্।"** সুতরাং—**"সহজং কর্ম্মং কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ"**—হে কৌন্তেয়! যে কর্ম্ম যাহার প্রকৃতিগত বা সহজাত তাহা দূষণীয় হইলেও পরিত্যজ্য নহে। অতঃপর ৪৯ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন,—

> "অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
> নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥"

—যিনি সকল বিষয়েই অনাসক্তচিত্ত, ইন্দ্রিয়জয়ী ও স্পৃহাশূন্য, তিনি সন্ন্যাস বা কাম্যকর্ম্মত্যাগ দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কামনা বা বাসনামূলেই মানব

কর্ত্তৃত্বাভিমানে কর্ম্ম করে; কামনাবিহীন কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না, এবং কর্ত্তা না থাকিলে কর্ম্ম নামেও কিছুই অভিহিত হইতে পারে না, কর্ত্তা না থাকিলে কর্ম্ম হয় না এবং কর্ম্ম না থাকিলে কর্ত্তার অস্তিত্বও অসিদ্ধ হয়। কাযেই কামনা ত্যাগ করিলে অনাসক্তচিত্ত, নিগৃহীতাত্মা ও স্পৃহাহীন ব্যক্তির কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় যন্ত্রের ন্যায় কর্ম্মের ফল তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য কর্ম্মহীনতা। গীতার মতে নিষ্কর্ম্মা বা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব; "ন হি কশ্চিৎক্ষণমপিজাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।" সুতরাং নৈষ্কর্ম্ম্য কথাতে যে এখানে অনাসক্তভাবে ও স্পৃহাহীন চিত্তে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই বুঝাইয়া থাকে, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

গীতার পূজ্যপাদ ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ উল্লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যায় "নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি" কথার অর্থ করিয়াছেন "আত্মজ্ঞান", এবং "সন্ন্যাস" কথার অর্থ করিয়াছেন "সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগ।" তাঁহাদের মতে সমস্ত কর্ম্ম বর্জ্জন করিতে পারিলেই নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি হয়। কিন্তু কর্ম্ম না করিলে যে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হইতে পারে না, এবং সন্ন্যাসগ্রহণ বা কর্ম্মত্যাগ দ্বারাই যে মানুষ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে শ্রীভগবান সে কথা স্পষ্ট বাক্যেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

সুতরাং কর্ম্মসন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্যলাভের সিদ্ধান্ত যে গীতায়

সমর্থিত হয় নাই, একথা অবাধেই বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি কথার অর্থ **"আত্মজ্ঞান"** করিলে পরবর্ত্তী শ্লোকসকলের কোনই সার্থকতা থাকে না; কারণ আত্মজ্ঞানের উদয় হইলেই যে সাধক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত; যথা—**"ওঁ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'**। অতএব আত্মজ্ঞান জন্মিলে আর কোন সাধনেরই প্রয়োজন থাকে না; অথচ পরবর্ত্তী শ্লোক কয়টীতে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির পর কিরূপে সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইবে, সেকথাই বিবৃত হইয়াছে। কাযেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি কথার অর্থ আত্মজ্ঞান, এবং সন্ন্যাস বা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ দ্বারা উহা প্রাপ্তির প্রসঙ্গ কখনই গীতার বক্তার অভিপ্রেত হইতে পারে না। তার পর, সন্ন্যাস কথার অর্থ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ করিলে, তৎফলে আত্মজ্ঞানের উদয়ও গীতার অনুমোদিত নহে; কারণ চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে ভগবান দৃঢ়তার সহিতই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করিলে কালে আপনা হইতেই জ্ঞানোদয় হইয়া থাকে; যথা—**"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।"** ইহার পর, ভগবান বলিয়াছেন,—**"শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"**—ভগবদ্বাক্যে বা গুরূপদেশের প্রতি যাহার গভীর শ্রদ্ধা আছে, এবং যিনি তদনুরূপ সাধনপরায়ণ ও ইন্দ্রিয়ব্যাপারে সংযমশীল, তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং সন্ন্যাস বা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ কখনই গীতার অভিপ্রেত নহে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই শ্রীভগবান অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাস ও ত্যাগ কথা কি অর্থে গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়া দিয়াছেন। সেই ভগবদুক্তি এইরূপ,—

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥"

—সূক্ষ্মদর্শিব্যক্তিগণ কাম্যকর্ম্মসমূহের ত্যাগকেই সন্ন্যাস, এবং সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগকে বিচক্ষণগণ ত্যাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং গীতার মতে সন্ন্যাস অর্থতো সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ নহেই, ত্যাগ শব্দও গীতাতে কর্ম্মত্যাগ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। সন্ন্যাস শব্দে উল্লিখিত অর্থ অনুসারে যাহারা কামনা বা বাসনা ত্যাগ করিয়া অনাসক্তভাবে প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারাই সন্ন্যাসী-পদবাচ্য। অধ্যায়ের প্রথমেই সন্ন্যাস শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, সে অধ্যায়েই প্রযুক্ত সন্ন্যাস শব্দের অন্যরূপ অর্থ কখনই বক্তার অভিপ্রেত হইতে পারে না। কাযেই উল্লিখিত ৪৯ শ্লোকে 'সংন্যাসেন' পদ যে এই অর্থেই ভগবান প্রয়োগ করিয়াছেন, সেবিষয়ে সন্দেহ করার অবসর নাই। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২ শ্লোকেও ভগবান বলিয়াছেন,—শ্রুতিতে যাঁহা সন্ন্যাস বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্জ্জুন! তাহাই তুমি কর্ম্মযোগ বলিয়া জানিবে; কারণ যে সঙ্কল্পত্যাগ করিতে পারে নাই, সে কখনও যোগী হইতে পারে না; যথা—

"যং সংন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥"

ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকস্থিত উক্ত ভগবদ্বাক্য হইতেও প্রতিপাদিত হয় যে, সঙ্কল্প বা কামনা ত্যাগের নামই সন্ন্যাস, কর্ম্মত্যাগ গীতার সন্ন্যাসের লক্ষ্যীভূত নহে। তার.পর, অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন,—

"অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥"

—অত্যাগী ব্যক্তিবর্গ, অর্থাৎ—যাহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করে নাই, তাহারাই মৃত্যুর পর অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্ররূপ কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু কামনাত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের ঐসকল কর্ম্মফল কখনও ভোগ করিতে হয় না। কর্ম্মফল ত্যাগই যে যথার্থ ত্যাগ, এবং কর্ম্মফলত্যাগী ব্যক্তিই যে যথার্থ ত্যাগী, সেকথা ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ের ২ ও ১১ শ্লোকে স্পষ্টভাবেই প্রচার করিয়াছেন; সুতরাং উল্লিখিত শ্লোকে অত্যাগী অর্থ যে কর্ম্মফলাসক্ত ব্যক্তি, এবং সন্ন্যাসী অর্থ কাম্যকর্ম্মত্যাগী পুরুষ, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। সন্ন্যাসীদিগকে দেহান্তে কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল ভোগ করিতে হয় না, এই ভগবদ্বাক্য হইতেও অবিসম্বাদিতরূপেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, গীতার মতে সন্ন্যাসিগণ কর্ম্মত্যাগী নহে; কর্ম্মত্যাগী হইলে কর্ম্মফল-ভোগের কথাই উঠিতে পারিত না।

গীতার মতে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ, অর্থাৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিরত থাকা, মানবের পক্ষে একেবারে অসম্ভব; তাই ১১ শ্লোকে ভগবান বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন,—"ন হি দেহভৃতা শক্যং

ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ”—দেহধারী সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। এই ভগবদ্বাক্য হইতে এইরূপ সংশয় উঠিতে পারে যে, মানুষ সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মত্যাগে সমর্থ না হইলেও অনেক সময়ই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিবে না কেন? শ্রীভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে সে সন্দেহেরও নিরসন করিয়া রাখিয়াছেন; সেই শ্লোকে বলা হইয়াছে, কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না; সকলেই প্রকৃতির গুণের প্রভাবে সতত অবশভাবে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়া থাকে; যথা—

“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥”

সুতরাং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগের কথা যে গীতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, তাহা অবাধেই বলা যাইতে পারে। কথা উঠিতে পারে, কর্ম্ম যখন বন্ধনের হেতুভূত, তখন কর্ম্ম ত্যাগ না করিলে মুক্তিলাভ হইবে কিরূপে? গীতায় ভগবান এসমস্যারও সমাধান করিয়াছেন। কর্ম্ম না করিয়া যখন থাকিবার উপায় নাই, তখন কর্ম্ম করিয়াও যাহাতে বন্ধনদশাগ্রস্ত হইতে না হয়, কর্ম্মানুষ্ঠানকালে তেমন কৌশল অবলম্বন আবশ্যক। সেই কৌশলের নামই যোগ—“যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্”। কর্ম্মযোগের প্রণালীতে বাসনা-বর্জ্জনপূর্ব্বক অনাসক্তভাবে ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম কখনই বন্ধনের কারণ হয় না, এবং ভোগে প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ হইয়া গেলেই জীব মুক্তিলাভে সমর্থ

হয়। যেভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না, নবম অধ্যায়ের ২৭।২৮ শ্লোকে ভগবান তাঁহার উপদেশ প্রদানার্থ বলিয়াছেন,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥"

—অর্জ্জুন! তুমি যে কোন কার্য্যই কর, যাহা কিছু আহার করিয়া থাক, যেরূপ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কর, যাহা দান কর এবং যেরূপ তপস্যাদি করিয়া থাক, তাহা সমস্তই আমাতে অর্পণ করিও। এরূপ করিলেই শুভাশুভফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে, এবং কাম্যকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা যোগযুক্ত হইয়া মুক্তিলাভপূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে। এখানেও সন্ন্যাসপদ কাম্যকর্ম্মত্যাগ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে; সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ অর্থ করিলে 'যৎ করোষি' প্রভৃতি কথার কোন সার্থকতাই থাকে না। সুতরাং কর্ম্মযোগীই যে গীতার সন্ন্যাসী, কর্ম্মত্যাগী নহে, সেবিষয়ে সন্দেহের অণুমাত্রও অবসর থাকিতেছেনা। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই গীতার মতে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

কর্ম্ম করিলেও যে কর্ম্ম না করার সমান ফল হয়, গীতায় শ্রীভগবান সেই অত্যাশ্চর্য্য কৌশলই প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহা চতুর্থ অধ্যায়ের ১৮।২০।২১।২২ শ্লোকে নিম্নরূপ বর্ণিত আছে;—

"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে॥"

—যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ—কর্ম্ম ও অকর্ম্ম যিনি সমভাবে গ্রহণপূর্ব্বক অকর্ম্মে বিরক্তি ও কর্ম্মে আসক্তি প্রকাশ না করিয়া প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান ও যোগযুক্ত, এবং তিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠাতা। তিনি কর্ম্মফলে আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক সতত সন্তুষ্টচিত্ত, এবং কোন বিশেষ ব্যাপারে লিপ্ত না থাকাতে নিয়ত নিরালম্বের ন্যায় অবস্থান করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে কিছুই করেন না। এইরূপ যোগীপুরুষ আশাশূন্য, সতত সংযতচিত্ত ও সংযতাত্মা, এবং সর্ব্ববিধ পরিগ্রহত্যাগী হইয়া কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করাতে কোনরূপ পাপগ্রস্ত হ'ন না। তিনি যখন যাহা প্রাপ্ত হ'ন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া, ভাল-মন্দ বা সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বের অতীত ও মদ-মাৎসর্য্য-বিরহিত, এবং কর্ম্মের সফলতায় বা অসাফল্যে সমভাবাপন্ন হওয়াতে কর্ম্ম করিয়াও বন্ধনে আবদ্ধ হ'ন না। এই ভগবদুক্তি

হইতে অবিসম্বাদিতরূপেই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,উল্লিখিতরূপে সংসারে সকল রকম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মবন্ধনের কোনই আশঙ্কা থাকে না; সুতরাং মুক্তিলাভের জন্য কর্ম্মত্যাগ প্রয়োজন, এমন কথা গীতার সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত।

ইহার পর পঞ্চম অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥"

—যিনি কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণপূর্ব্বক কর্ম্মাসক্তি বর্জ্জন করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না তেমন তিনিও কর্ম্মজনিত পাপে লিপ্ত হ'ন না। গীতার বহু স্থলেই কর্ম্মানুষ্ঠানের এই প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং এইভাবে কর্ম্ম করিলেই গীতার মতে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি শব্দ যে এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অণুমাত্রও অবসর নাই। পরবর্ত্তী ৫০ শ্লোকে সিদ্ধি পদ দ্বারা এইরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিরই উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং এই সিদ্ধিলাভের পর কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, সেকথা ভগবান তৎপরবর্ত্তী কয়েক শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। ৫১।৫২।৫৩ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত, ধৃতির সহায়ে সংযতাত্মা, শব্দাদি বিষয়ত্যাগী, অনুরাগ ও বিরাগবর্জ্জিত, নির্জ্জনস্থানবাসী, পরিমিতাহারী, বাক্য, শরীর ও মনের সংযমপরায়ণ, ধ্যানযোগনিরত, সতত

বৈরাগ্যবান, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহবিরহিত, মমতাবিহীন ও উদ্বেগশূন্য হইতে পারিলেই মানব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের যোগ্য হইয়া থাকে। এইরূপ যোগ্যতালাভ হইলে,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥
(অষ্টাদশ অধ্যায়, ৫৪।৫৫ শ্লোক)

—ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের যোগ্য সাধকের চিত্ত সতত প্রসন্ন থাকে, এবং সে কোনও কারণেই শোক করে না, কোন বিষয়ে তাহার আকাঙ্ক্ষাও থাকে না; তখন সেই সাধক সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমার পরাভক্তি লাভ করে। অতঃপর সেই পরাভক্তির প্রভাবে সে স্বরূপতঃ আমি যেরূপ ও যাহা, তাহা জানিতে পারে, এবং এইভাবে আমাকে যথার্থরূপে জানিতে পারিয়া সে আমার সেই স্বরূপে বিলীন হইয়া যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের উল্লিখিত ৫১—৫৫ শ্লোকে "বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তঃ" প্রভৃতি ভগবদ্বাক্যে যে কর্ম্ম, "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" প্রভৃতি উক্তিতে ভক্তি, এবং "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" কথায় জ্ঞানই লক্ষ্যীভূত, স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই সকলে তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। সুতরাং একথা অবাধেই বলা যাইতে পারে যে, গীতার সিদ্ধান্তমতে কর্ম্মদ্বারা ভক্তিলাভের যোগ্যতা হয়, ভক্তিলাভ হইলে তৎপ্রভাবে জ্ঞানের উদ্রেক

হইয়া থাকে, এবং তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে সাধক ব্রহ্মে কৈবল্যপ্রাপ্ত হ'ন। ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে, ভক্তিলাভ হইলেই কর্ম্মত্যাগ, এবং ভক্তির প্রভাবে জ্ঞানোদয় হইলে কর্ম্ম ও ভক্তি বর্জ্জন করিতে হইবে; গীতার সিদ্ধান্ত এরূপ ধারণার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। গীতার মতে বিদেহমুক্তি বা কৈবল্য-লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনই সমভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।

কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—এই তিনটী পরস্পরবিচ্ছিন্ন সাধনপ্রণালী নহে, উহারা একই সাধনপ্রণালীর অন্তর্ভূত, এবং সমকালে সম্মিলিতভাবে সাধকের সিদ্ধিলাভের সহায়ক। এই তিনের কোন একটীকে বা দুইটীকে বাদ দিয়া নিঃশ্রেয়সলাভ গীতার অনুমোদিত নহে। গীতায় শ্রীভগবান বিশেষভাবে যে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ সাধনেরই সম্মিলিতাবস্থা; ভক্তি ও জ্ঞান ব্যতীত গীতার কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠিতই হইতে পারে না। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সম্মিলনে ও সংমিশ্রণে গঠিত কর্ম্মযোগ-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াই শ্রীভগবান তৎকালে সাধন-ক্ষেত্রে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সমন্বয়সাধন করিয়াছেন, এবং ঐরূপ মীমাংসার নিমিত্তই গীতা বেদান্তের চরমপ্রস্থানরূপে গৌরবান্বিত হইয়াছে।

শ্রুতিতে জ্ঞানই কৈবল্যলাভের হেতুভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। মুক্তিকোপনিষদের শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে—"অন্তঃ

সর্ব্বেষাং কৈবল্যমুক্তির্জ্ঞানমাত্রেণোক্তা। ন কর্ম্ম-সাংখ্যযোগোপাসনাদিভিরিত্যুপনিষৎ॥” —অতএব কথিত হইয়াছে, একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই সকলের কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়। কর্ম্ম, সাংখ্য, যোগ, উপাসনা প্রভৃতি মুক্তিলাভের কারণ নহে। কেমন করিয়া জ্ঞানপ্রভাবে কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়, তাহাও উক্ত উপনিষদে পরিব্যক্ত আছে; যথা—

“মুমুক্ষবঃ পুরুষাঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাবন্তং সৎকুলভবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ত্রবাৎসল্যং গুণবন্তমকুটিলং সর্ব্বভূতহিতেরতং দয়াসমুদ্রং সদ্‌গুরুং বিধিবদুপসঙ্গম্যোপহারপাণয়োঽষ্টোত্তরশতোপনিষদং বিধিবদধীত্য শ্রবণ-মননিদিধ্যাসনানি নৈরন্তর্য্যেণ কৃত্বা প্রারব্ধক্ষয়াদ্দেহত্রয়ভঙ্গং প্রাপ্যোপাধিবিনির্ম্মুক্তঘটাকাশবৎ পরিপূর্ণতা বিদেহমুক্তিঃ সৈব কৈবল্যমুক্তিরিতি।”

—অর্থাৎ মুমুক্ষু পুরুষগণ সাধনচতুষ্টয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া শ্রদ্ধাবান্, সৎকুলজাত, শ্রোত্রিয়, শাস্ত্রবৎসল, গুণবান, অকুটিল, সর্ব্বভূতের হিতসাধনপরায়ণ, দয়ার সাগর সদ্‌গুরুর সমীপে উপহারহস্তে বিধিপূর্ব্বক গমন করিয়া যথাবিধানে ১০৮ খানি উপনিষদ্ অধ্যয়নপূর্ব্বক অনুক্ষণ সেই অধীত তত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে, প্রারব্ধ নিঃশেষ হওয়ার পর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ দেহের বিলয়ে উপাধিবিহীন ঘটাকাশের ন্যায় যে পরিপূর্ণতা লাভ করেন, তাহার নাম বিদেহ-মুক্তি, এবং তাহাই কৈবল্যমুক্তি।

উল্লিখিত শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, মোক্ষকামী

সাধকের প্রথমে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইতে হইবে। সেই সাধনচতুষ্টয় হইতেছে,—(১) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক — জগতে নিত্য পদার্থ কি এবং অনিত্য পদার্থই বা কি, বিচার দ্বারা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ ; (২) ইহামুত্র ফলভোগ-বৈরাগ্য — ইহলোকে অথবা পরলোকে কোনরূপ ফলভোগের জন্য আশক্তি না থাকা ; (৩) শম-দমাদি ষট্‌সম্পত্তি — বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহাদি ; (৪) মুমুক্ষুত্ব — মোক্ষলাভের নিমিত্ত অদম্য আগ্রহ। এই সকল সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে যে কর্ম্মের প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। সুতরাং একথা বলা অসঙ্গত নহে যে, শ্রুতির নির্দ্দেশ অনুসারেও কর্ম্মই কৈবল্যলাভের প্রথম সাধন। তার পর, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে উপযুক্ত সদ্‌গুরুর সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ১০৮ খানি উপনিষদ্ বা বেদান্ত-গ্রন্থ অধ্যয়ন ; এই ব্যাপার যেমন কর্ম্মমূলক, তেমন ইহাতে ভক্তিও একান্ত আবশ্যক। কারণ ভক্তিভরে গুরুদেবের শরণাগত হইয়া সেবা দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিতে না পারিলে বিদ্যালাভ করা যায় না। তাই শাস্ত্রের বিধান রহিয়াছে—"গুরুশুশ্রূষয়া বিদ্যা"—গুরুর শুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যালাভ করিতে হয়। গীতাতেও ভগবান একথাই বলিয়াছেন,—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"—প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। সেবা বা শুশ্রূষা যেমন কর্ম্মসাধ্য, তেমন উহা ভক্তিমূলকও

বটে। তার পর, গুরুর নিকট অধীত উপনিষদ্ বিস্তার অনুক্ষণ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এখানে শ্রবণ কথায় বেদান্তবাক্যের সর্ব্বদা স্মরণও বুঝাইয়া থাকে; মনন শব্দের অর্থ দর্শনশাস্ত্রের যুক্তির সাহায্যে শ্রুত বিষয়ের অভ্রান্ততা নির্দ্ধারণ, এবং নিদিধ্যাসন কথায় অভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত তত্ত্বের ধ্যান বুঝায়। এই নিদিধ্যাসন বা ধ্যানবলেই বিস্তা সম্পূর্ণরূপে অধিগত হইয়া থাকে।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই আত্মদর্শনের হেতুভূত বলিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদের শ্রুতিতেও নির্দ্ধারিত হইয়াছে; যথা—**"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"** —এই আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে। রূপগুণাতীত আত্মার দর্শন সম্ভব হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন, —আত্মতত্ত্ব শ্রবণ, শ্রুত তত্ত্বের মনন এবং মননান্তে নির্দ্ধারিত সত্যের ধ্যান করিলেই আত্মদর্শন হয়। শ্রবণ-মননাদি সম্বন্ধে শ্রুতির নির্দ্দেশ এই যে,—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

—শ্রুতি বা বেদান্তবাক্য হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে; তৎপর মনন, অর্থাৎ-যুক্তির সাহায্যে শ্রুত বিষয়ের অভ্রান্ততা নির্দ্ধারণ। অবশেষে মনন দ্বারা নির্ণীত তত্ত্বের সতত ধ্যান করা প্রয়োজন; এসকলই আত্মদর্শনের হেতুভূত। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন যেমন কর্ম্মসাধ্য, তেমন সেজন্য ভক্তি

এবং জ্ঞানেরও বিশেষ আবশ্যক। জ্ঞানের সহায়তা ব্যতীত মনন বা শ্রুত বিষয়ের অভ্রান্ততানির্দ্ধারণ যেমন সম্ভবপর নহে, তত্ত্বের প্রতি অনুরাগ বা ভক্তি না হইলে, অনুক্ষণ তাহার আলোচনা, এবং ধ্যানও তেমন অসম্ভব। সুতরাং এখানে যেমন কর্ম্মের, তেমন জ্ঞান এবং ভক্তিরও প্রয়োজন আছে। নিদিধ্যাসনের ফলে, তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করে; ঐরূপ আত্মজ্ঞানের আলোকে জীব ও ব্রহ্মে অভেদ উপলব্ধি দ্বারা কৈবল্যলাভ হইয়া থাকে। কাযেই শ্রুতির সিদ্ধান্ত অনুসারে তত্ত্ব-জ্ঞানই মুখ্যরূপে কৈবল্যলাভের হেতুভূত হইলেও, ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সকলই সমান সহায়ক। অতএব গীতায় শ্রীভগবান কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সংমিশ্রণে গঠিত কর্ম্মযোগ-প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়া যে নিঃশ্রেয়সলাভের সহজ ও সরল পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা শ্রুতিসম্মত সন্দেহ নাই। কর্ম্ম ও ভক্তির সহায়ে জ্ঞানোদয় হইলেই মোক্ষলাভ হয় বলিয়া শ্রুতিতে একমাত্র জ্ঞানের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে; সেজন্য এরূপ মনে করা সমীচীন হইবে না যে, মোক্ষলাভের নিমিত্ত কর্ম্ম ও ভক্তির কোনই প্রয়োজন নাই। সদ্‌গুরুর নিকট উপনিষদ্‌-বিদ্যা অধ্যয়নের ফলেই গীতায় বর্ণিত বিশুদ্ধবুদ্ধি প্রভৃতির উদয় হইয়া থাকে, এবং তৎপর পরম তত্ত্বে পরাভক্তির উদ্রেক হওয়াতে সাধক তত্ত্বজ্ঞানজনিত অপরোক্ষানুভূতিতে কৈবল্য প্রাপ্ত হ'ন।

মুক্তিকোপনিষদের উল্লিখিত শ্রুতিতে নিরন্তর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের উপদেশ আছে। নিরন্তর অর্থাৎ— সকল সময় অবিচ্ছেদে, ঐসকল কর্া সম্ভব হইতে পারে কিরূপে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নহে; কারণ বিশেষ অভ্যাসের ফলে জাগ্রদ-বস্থায় সতত ঐরূপ করা সম্ভবপর হইলেও, নিদ্রাকালে যখন মানুষ আত্মবিস্মৃত থাকে, তখনও ঐরূপ কার্য্য চলিতে পারে, ইহা সকলের বিশ্বাসযোগ্য নাও হইতে পারে। কাযেই আপাতদৃষ্টিতে শ্রুতিবাক্যের সত্যতায় সন্দেহ উঠা অসম্ভব নহে। কিন্তু সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত, শ্রুতিবাক্য অভ্রান্ত — উহাতে ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা নাই। কেমন করিয়া নিরন্তর শ্রবণ-মননাদি সম্ভবপর হয়, সদ্‌গুরুর নিকট যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় উপদেশ পাইয়াছেন, তাঁহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সকলেই জানেন, জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত জীবমাত্রেরই একটী ব্যাপার অনুক্ষণ অবিচ্ছেদে চলিয়া থাকে — জীবিতকালে ক্ষণেকের জন্যও উহার বিরাম হয় না। ইহা হইতেছে জীবের জীবনরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু-প্রবাহ; স্বভাবের বিধানেই ইহা সম্পন্ন হয় বলিয়া, কেহ স্বেচ্ছায় উহার ব্যতিক্রম না ঘটাইলে, এই প্রবাহের নৈরন্তর্য্য স্বতঃসিদ্ধ। সদ্‌গুরু শিষ্যকে এই অবিরাম গতির লক্ষ্য দেখাইয়া দেন, এবং কিছুদিন তদনুসারে সাধন করিলেই এই শ্রবণাদি ব্যাপারের নৈরন্তর্য্য রক্ষিত হইয়া থাকে।

এই ক্রিয়ার ফলেই জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপলব্ধি হয়। এসম্বন্ধে ইহার অধিক আর সাধারণ্যে প্রকাশযোগ্য নহে।

গীতায় কর্ম্মযোগ।

কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমবায়ে এবং সমন্বয়ে সংগঠিত পূর্ব্ববর্ণিত এই যে অভিনব সাধনপ্রণালী, ইহাই গীতার কর্ম্মযোগ, এবং মানবসমাজের পরমকল্যাণ সাধনকল্পে ইহা শ্রীভগবানের অমূল্য অবদান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জ্জুনকে স্বজনবধাশঙ্কা-জনিত শোকের অলীকতা প্রতিপাদনার্থ আত্মার নিত্যত্ব বর্ণনপূর্ব্বক ৩৯ শ্লোক হইতে যোগবুদ্ধি বা কর্ম্মযোগের বর্ণনায় অগ্রেই বলিয়াছেন,—"বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি"—হে পার্থ! যে বুদ্ধিলাভ করিতে পারিলে তুমি কর্ম্মবন্ধন পরিহার করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং এই যোগবুদ্ধি বা কর্ম্মযোগ যে নিঃশ্রেয়সজনক, সেকথা শ্রীভগবান মুখবন্ধেই বলিয়া রাখিয়াছেন। ৪৫ শ্লোকে অর্জ্জুনকে এই যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত 'নিস্ত্রৈগুণ্য, নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম ও আত্মবান' হইতে বলা হইয়াছে; যথা—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥"

সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের ক্রিয়াবশেই মানব বিভিন্নরূপ কামনামূলে নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকে। কর্ম্মমাত্রই সাধারণভাবে কামনামূলে অনুষ্ঠিত হওয়াতে বন্ধনের বা পুনঃ পুনঃ সংসারে পরিভ্রমণের কারণ হয়; কিন্তু মানব যদি গুণের প্রভাবে বিচলিত না হইয়া অনাসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে আর তাঁহাকে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না। কর্ম্মযোগে এই ভাবেই কর্ম্ম করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং এজন্য ভগবান অর্জ্জুনকে প্রথমেই নিস্ত্রৈগুণ্য হইতে বলিয়াছেন। গুণের প্রভাবেই কামনা বা বাসনার উদ্ভব হয়; সুতরাং গুণাধীন না হইলে আর কামনামূলে কর্ম্মানুষ্ঠানের আশঙ্কা থাকে না। কর্ম্মযোগে এই কারণে নিস্ত্রৈগুণ্য হওয়া প্রথম প্রয়োজন। তার পর, এই যোগে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখাদি বিপরীত ভাব সমস্ত সমভাবে গ্রহণ করার জন্য নির্দ্বন্দ্ব হইতে হইবে। সতত সত্ত্বগুণে অবস্থিত থাকিতে না পারিলে কর্ম্মযোগের সম্যক্ অনুসরণ সম্ভবপর নহে। যোগ (অপ্রাপ্ত বস্তুপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা) ও ক্ষেম (প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণার্থ যত্ন) সম্বন্ধে উদাসীন না হইলেও কর্ম্মযোগের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সর্ব্বশেষে আত্মবান্ বা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন হইলেই কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ করা যায়। এইজন্য কর্ম্মযোগের কথা আরম্ভ করিয়াই শ্রীভগবান উহার মূলতত্ত্ব কয়টী সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গীতায় কর্ম্মযোগের বর্ণনায় এসকল বিষয়ই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে অর্জ্জুনকে যোগস্থ

হইয়া কর্ম্ম করার উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ভগবান সর্ব্ববিষয়ে সমত্ব বা সমভাবকেই যোগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ; যথা—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

—হে অর্জ্জুন ! তুমি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি—কর্ম্মের সফলতা ও বিফলতা—সমভাবে গ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ-সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া, কর্ম্মে আসক্তি-বর্জ্জনপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। এই সমত্বই কর্ম্মযোগ নামে অভিহিত হয়। সমত্ব বা সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিই কর্ম্মযোগের প্রধান কথা ; এজন্যই কর্ম্মযোগে নির্দ্বন্দ্ব ও আত্মবান হওয়া একান্ত আবশ্যক। আত্মজ্ঞান না জন্মিলে, সুখ-দুঃখাদি বিপরীত অবস্থা সমভাবে গ্রহণ করা যায় না ; তাই আত্মজ্ঞানের বর্ণনকালেও শ্রীভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৫ ও ৩৮ শ্লোকে এই সমত্বের কথাই বিশেষভাবে বলিয়াছেন ; যথা—

"যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥"

ইহার পর ৫০ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥"

—যোগবুদ্ধিযুক্ত সাধক এই সংসারে সুকৃত (পুণ্য—সৎকর্ম্ম)

ও দুষ্কৃত (পাপ—অপকার্য্য) এই উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ—কিবা পুণ্য কিবা পাপ কোন বিষয়েই তাঁহার আসক্তি বা বিরক্তি থাকে না। অতএব, হে অর্জ্জুন! তুমিও এইরূপ সমত্বসূচক যোগবুদ্ধির আশ্রয় করিতে যত্নবান হও। কারণ, যোগই কর্ম্মসাধনের কৌশলস্বরূপ। কৌশলে কর্ম্ম করিতে পারিলে যেমন কর্ম্মসম্পাদনের ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, তেমন কর্ম্মযোগের প্রণালীতে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে পরিণামে কর্ম্মবন্ধনরূপ দুর্ভোগেরও আশঙ্কা থাকে না; সুতরাং এই যোগই কর্ম্মানুষ্ঠানের কৌশলস্বরূপ। ইহার পরই শ্রীভগবান বলিয়াছেন, এই কর্ম্মযোগে ফলবাসনা-বর্জ্জনপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানেই কৈবল্যলাভ হইয়া থাকে; যথা —

> "কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
> জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥'

—যোগবুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ, অর্থাৎ—কর্ম্মযোগিগণ, কর্ম্মজনিত ফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করাতে জন্মরূপ সংসারবন্ধন হইতে চিরতরে অব্যাহতি লাভ করিয়া যে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেবিষয় সংশয়াতীত। এই সকল ভগবদ্বাক্যে পাঠক দেখিতে পাইবেন, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—এই তিনই এক সঙ্গে অনুসৃত না হইলে কর্ম্মযোগানুষ্ঠান সম্ভবপর নহে, এবং এই যোগে সিদ্ধিলাভ করিলে, মোক্ষপদপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও কোনই সন্দেহ থাকে না।

গীতার মতে, কর্ম্মযোগই নিঃশ্রেয়সলাভের সহজ ও সুগম

পন্থা। জ্ঞানবাদিগণ কর্ম্মসন্ন্যাস বা সর্ব্বকর্ম্মত্যাগই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির হেতুভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও, গীতায় শ্রীভগবান যে কর্ম্মযোগকেই তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে তাহা অবিসম্বাদিত-রূপেই পরিব্যক্ত আছে। তথায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥"

—সন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগ এবং কর্ম্মযোগ, অর্থাৎ—ভগবানের উপদিষ্ট প্রণালীতে কর্ম্মানুষ্ঠান—এই উভয়ই নিঃশ্রেয়সজনক; কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে নিঃশ্রেয়সলাভের নিমিত্ত কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সাংখ্যযোগে, অর্থাৎ—জ্ঞানমার্গে, কর্ম্মত্যাগের উপদেশ প্রদত্ত হয়, এবং কর্ম্মত্যাগের ফলেই নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞানিগণ নির্দ্দেশ করেন; পক্ষান্তরে গীতায় কর্ম্মযোগে ভগবান অনাসক্তভাবে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানেরই উপদেশ দিয়াছেন, এবং তাহাতেই নিঃশ্রেয়সলাভ হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের মতে উভয়ই নিঃশ্রেয়স-কর হইলেও, কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ অনুসারেই সহজে ও সুখে সিদ্ধিলাভ করা যায়। অতঃপর ভগবান বলিয়াছেন, কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়কে অজ্ঞান *বালকেরাই পৃথক্ মনে করে, পণ্ডিতেরা তাহা স্বীকার করে না; বস্তুতঃ উভয়ই সমানফলপ্রদ ও একরূপ। ইহার যে কোনটার অনুসরণেই উভয়ের ফলস্বরূপ

মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সাংখ্যগণ (জ্ঞানী সাধকেরা) যে স্থান লাভ করে, কর্ম্মযোগীরাও তাহাই প্রাপ্ত হয়; সুতরাং সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ যে এক বলিয়া বুঝিতে পারে সে-ই যথার্থদর্শী। এসম্বন্ধে ভগবদ্বাক্য এইরূপ,—

"সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তৎ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥"

কেবল ইহাই নহে, কর্ম্মযোগ আশ্রয় না করিয়া কর্ম্মসন্ন্যাস করিলে তাহা দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে, এবং যোগযুক্ত ব্যক্তিরাই অচিরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হ'ন, একথাও ভগবান পরবর্ত্তী শ্লোকে দৃঢ়তার সহিতই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা —

"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥"

কর্ম্মফলের কামনা না রাখিয়া যিনি প্রকৃতির অনুরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, নিরগ্নি এবং নিষ্ক্রিয় না হইলেও, তিনিই যে যথার্থ সন্ন্যাসী, এবং তিনিই যে যোগী, ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই সে তত্ত্বও পরিব্যক্ত হইয়াছে; যথা —

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সংন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥"

প্রাচীনকালে সমস্ত গৃহস্থই অগ্নিরক্ষা করিতেন; কোন গৃহস্থ সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে তাঁহাকে ঐ অগ্নিতে হোম করিয়া

অগ্নিস্পর্শ বর্জ্জন ও শরীর রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় কর্ম্ম ব্যতীত অপর সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিতে হইত। কাযেই সন্ন্যাসী হইলেই নিরগ্নি ও অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় হওয়া প্রয়োজন ছিল। এই শ্লোকে সেজন্য ভগবান বলিতেছেন, নিরগ্নি ও নিষ্ক্রিয় না হইলেও, যিনি কর্ম্মফলে উদাসীন থাকিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত আছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী-পদবাচ্য; সুতরাং গীতায় কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাসের ফলের মধ্যে কোন পার্থক্যই স্বীকৃত হয় নাই।

কর্ম্মযোগের প্রণালীতে কর্ম্মানুষ্ঠানই যে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের হেতুভূত, চতুর্থ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে শ্রীভগবান কর্ম্মের তত্ত্ব বর্ণনকালেও সেকথা স্পষ্টবাক্যেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তথায় বলা হইয়াছে, সংসারে কর্ম্ম কি এবং অকর্ম্মই বা কি, তাহা নির্ণয় করিতে যাইয়া পণ্ডিতগণও মোহগ্রস্ত হইয়া থাকেন; সুতরাং কর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণন করা যাইতেছে, যাহা জানিতে পারিলে নিঃসংশয়ে অশুভ বা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। সেই ভগবদ্বাক্য এইরূপ,—

"কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥"

—এখানে ভগবান বলিতেছেন, কর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেই অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়; ইহার অর্থ এরূপ নয় যে, কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া কর্ম্মবর্জ্জনপূর্ব্বক

মোক্ষলাভ করিতে হইবে; কারণ ঐরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে পরবর্ত্তী ১৭।১৮ শ্লোক সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে, উক্ত শ্লোকে যে কর্ম্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানেই মুক্তিলাভের কথা বলা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ১৮ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন,—যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখিতে পান এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা সেই ব্যক্তিই যোগযুক্ত; যথা—

'কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

—এই ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, সংসারে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বলিয়া যিনি কোনরূপ পৃথগ্‌দৃষ্টি করেন না, এবং প্রকৃতির বিধানে যখন যেরূপ কর্ম্ম উপস্থিত হয় নিষ্কামভাবে তখনই তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেরই অনুষ্ঠানপরায়ণ এবং যথার্থ যোগযুক্ত। সুতরাং গীতার মতে, কর্ম্মানুষ্ঠানই যে নিঃশ্রেয়সলাভের কারণ, কর্ম্মত্যাগ নহে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অণুমাত্রও অবকাশ থাকিতেছে না।

যোগবুদ্ধিতে বা কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত যে প্রণালীতে যোগানুষ্ঠান প্রয়োজন, গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীভগবান তাহা বর্ণন করিয়া, তাহার সাধনের নিমিত্ত পরবর্ত্তী ছয় অধ্যায়ে ভক্তির, এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রয়োজন

প্রতিপাদন করিয়াছেন। ভক্তি ও জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্মযোগ সত্য সত্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া থাকে; কারণ সকল সাধনের উদ্দেশ্যই ভগবৎপ্রাপ্তি এবং তন্নিমিত্ত কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই ত্রিধারারই সম্মেলন বা সমান সহায়তা একান্ত আবশ্যক। ভক্তি ও জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ম্ম, কিম্বা কর্ম্ম ও জ্ঞান ব্যতীত কেবল ভক্তি, অথবা কর্ম্ম ও ভক্তিবিহীন একমাত্র জ্ঞান যে পরমার্থলাভের বা ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় নহে, গীতায় শ্রীভগবান সে তত্ত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাই গীতার প্রথমে কর্ম্ম, তৎপর ভক্তি এবং শেষে জ্ঞানের কথা আলোচিত হইয়াছে। পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তি ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ; শ্রুতি বলিয়াছেন,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ (মুণ্ডক)"। তিনি কৃপা করিয়া যে সাধককে বরণ করেন, সে-ই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়েও ভগবান একথাই বলিয়াছেন; কর্ম্মপ্রভাবে সাধক পরাভক্তি অর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীভগবানের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইয়া তাঁহারই মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেই সে কৈবল্যলাভ করে না—দেহান্তে ভগবৎকৃপায়ই তাহার কৈবল্যলাভ হয়। দেহপাতের পূর্ব্বে এইরূপ সাধক শ্রীভগবানের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রকৃতির বিধানানুরূপ সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, ভগবৎকৃপায়ই যে সে শাশ্বত ও অব্যয় পদ লাভ করে, অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে ভগবান সেকথা দৃঢ়তার সহিতই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥"

অনন্যভক্তিমূলেই এইরূপ ভগবৎকৃপা আকৃষ্ট হয়, এবং আত্মজ্ঞানের ইঙ্গিতে কর্ম্ম করিলে বন্ধনের ভয়ও থাকে না; কাযেই জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বিত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে সাধক ভগবৎকৃপায় পরমপুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়া চিরশান্তিলাভে সমর্থ হয়। ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জন, এবং ভক্তি সহকারে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে অনাসক্তচিত্তে নিজ নিজ অধিকারানুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ম্মযোগের মূলসূত্র; সুতরাং কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত যে ভক্তি ও জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন, সেকথা সহজবোধ্য। কারণ জ্ঞান না থাকিলে কর্ম্মফলের বাসনা ত্যাগ করা যায় না, এবং ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে অনাসক্তচিত্তে কর্ম্ম করাও সম্ভবপর নহে। কাযেই কর্ম্মযোগ সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ সাধনেরই সম্মিলন ও সমবায় একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। এই জন্যই গীতায় কর্ম্মযোগের বর্ণনপ্রসঙ্গে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের তত্ত্ব বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

কর্ম্মযোগে যে কোনরূপ আপদের আশঙ্কাই নাই, এবং ইহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইলেও যে সাধকের পরম-কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০ শ্লোকে শ্রীভগবান উহা জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়া এই সাধন-প্রণালীর সর্ব্বোপযোগিতা ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বই প্রদর্শন করিয়াছেন।

অন্য সকল সাধনেই ত্রুটি-বিচ্যুতিতে বা অপূর্ণ অনুষ্ঠানে আপদ্ ও অসাফল্য অবশম্ভাবী; কিন্তু শ্রীভগবানের মতে এই কর্ম্মযোগের ফল কোন অবস্থায়ই বিনষ্ট হয় না, এবং ইহাতে কোনরূপ পাতকেরও আশঙ্কা নাই। এই যোগ অল্প মাত্রায় অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠানকারী ভববন্ধনরূপ মহদ্ভয় হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকেন; যথা—

"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥"

কর্ম্মমূলেই যখন বিশ্বের বিকাশ, এবং অবস্থামাত্রই যখন কর্ম্মাত্মক, তখন কোন না কোন কর্ম্ম না করিয়া থাকার উপায় কাহারও নাই, একথা স্বীকার করিতেই হইবে; অতএব কর্ম্ম ভিন্ন গত্যন্তর না থাকাতে এই কর্ম্মানুষ্ঠানের কৌশল বা কর্ম্মযোগ অবলম্বন করাই যে আত্মকল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রের একমাত্র কর্ত্তব্য সেকথা অবিসম্বাদিত। ফলাকাঙ্ক্ষামূলে কর্ম্ম করাতেই কর্ম্মফলভোগের জন্য জীব সংসারে আবদ্ধ থাকে। কর্ম্মযোগে ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া কর্ম্ম করাতে বন্ধনের আশঙ্কা দূরীভূত হয়, এবং সাধক তৎফলে পরমকল্যাণের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। এজন্যই উল্লিখিত ৪০ শ্লোকে ভগবান দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মযোগের মহিমা কীর্ত্তন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। কর্ম্মযোগই গীতার লক্ষ্যীভূত; প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নানাভাবে এই কর্ম্মযোগের কথাই যে গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেবিষয়ে সংশয়ের

অবসর নাই। মনুষ্যমাত্রই প্রকৃতির প্রভাবে অবশের ন্যায় পরিচালিত হইলেও অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করাতেই কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। গীতায় শ্রীভগবান এই বন্ধন ভাঙ্গিবার কৌশল প্রদর্শন করিয়া পরমপুরুষার্থলাভের সহজ ও সুগম পন্থা নির্দ্দেশ করাতেই ইহা শাস্ত্রসমূহের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়াছে।

জ্ঞানমার্গের অনুসরণকারিগণ গীতাকে জ্ঞানমূলক, এবং ভক্তিপথের আশ্রয়কারীরা ইহাকে ভক্তিপ্রধান শাস্ত্র বলিয়া বর্ণন করিলেও, গীতায় প্রকৃত প্রস্তাবে যে জ্ঞান ও ভক্তি সমন্বিত কর্ম্মযোগের বিষয়ই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নাই। কর্ম্মযোগই যে গীতার মূলতত্ত্ব তাহা সহজে বুঝিবার নিমিত্ত অতঃপর প্রথম অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমগ্র গীতার মর্ম্ম আলোচনা করা যাইতেছে। সুধী পাঠক স্থিরচিত্তে গীতার এই তত্ত্বালোচনা পাঠ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমাদের এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বা অমূলক নহে। গীতার তত্ত্বালোচনায় পাঠক এমন অনেক কথা জানিতে পারিবেন, :যাহা এপর্য্যন্ত অপ্রকাশিত আছে। শ্রীশ্রীমদ্ ভগবান গুরুদেবের কৃপায় গীতার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব যতটুকু উপলব্ধি করা গিয়াছে, নিম্নে তাহাই সরলভাবে বিবৃত হইল।

গীতার তত্ত্বালোচনা।

প্রথম অধ্যায়—

কৌরবপতি অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন হইতেই গীতার সূচনা হইয়াছে, এবং এই প্রশ্নেই গীতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিহিত আছে; সুতরাং স্থিরচিত্তে অন্ধরাজের প্রশ্ন ভাবিয়া দেখিলেই গীতার উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে অনুমিত হইতে পারে। প্রথম শ্লোকেই ধৃতরাষ্ট্র প্রশ্ন করিয়াছেন,—

"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১॥"

—হে সঞ্জয়, কুরুক্ষেত্র নামক পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে আমার ও পাণ্ডুর পুত্রগণ যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইয়াই (যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে) কি করিয়াছিল?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মহাভারতান্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় হইতে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় পর্য্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভগবদগীতা নিবদ্ধ আছে। ইহার পূর্ব্বে মহাভারতে কোথাও গীতার কোনই উল্লেখ নাই। ভীষ্মপর্ব্বের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে জানাইলেন, দশদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া অপর পক্ষের বহুসহস্র বীরবর্গের নিধনসাধনপূর্ব্বক অন্ধরাজের পিতৃব্য সেকালের অদ্বিতীয় বীর ভীষ্মদেব সমরক্ষেত্রে

শরশয্যায় নিপতিত হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া অন্ধরাজ গভীর শোকপ্রকাশপূর্ব্বক কেমন করিয়া ভীষ্মের মত অজেয় বীর পরাভূত হইলেন, এবং কোন্ পক্ষ কি ভাবে যুদ্ধ করিয়াছে, সে সকল সম্বন্ধে সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন; সঞ্জয়ও পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত নয় অধ্যায়ে সে সকল কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তার পর, চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় হইতে গীতার সূচনা হইয়াছে, এবং অন্ধরাজ সঞ্জয়ের সকল কথা শুনিয়া তাহাকে এই প্রশ্ন করিতেছেন। সুতরাং এই প্রশ্ন করার সময় অন্ধরাজ যে দশদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধের সমস্ত বিবরণই অবগত ছিলেন, সে সম্বন্ধে সংশয় অসম্ভব। এ অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্র যে যুদ্ধবিষয়ক কোন কথা জানিবার জন্য 'কিমকুর্ব্বত' এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান একান্ত অস্বাভাবিক। কাযেই যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে যুদ্ধার্থ সমবেত উভয় পক্ষ কি করিয়াছিল, তাহা জানিবার জন্যই ধৃতরাষ্ট্র এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নাই। শ্লোকের প্রথম চরণস্থিত 'যুযুৎসবঃ' পদ হইতেও ইহাই প্রতীয়মান হইয়া থাকে যে, যুদ্ধাভিলাষী উভয় পক্ষ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবার পূর্ব্বে কি করিয়াছিল, অন্ধরাজ তাহাই জানিতে চাহিতেছেন; দ্বিতীয় চরণস্থিত 'এব' পদের সার্থকতাও ইহাই। সুতরাং নিম্নলিখিত-রূপে এই শ্লোকের অন্বয় করিয়া অর্থগ্রহণ করাই সমীচীন,—

হে সঞ্জয়! যযুৎসবঃ (যুদ্ধাভিলাষী) মামকাঃ (আমার পুত্রগণ) চ (এবং) পাণ্ডবাঃ (পাণ্ডুতনয়গণ) ধর্ম্মক্ষেত্রে

(শ্রুতি-সিদ্ধ ধর্ম্মস্থানে) কুরুক্ষেত্রে (কুরুক্ষেত্র নামক অঞ্চলে) সমবেতাঃ এব (সমবেত হইয়াই) কিং (কি) অকুর্ব্বত (করিয়াছিল)। গীতার পূজ্যপাদ টীকাকারগণের মধ্যে কেহ কেহ 'এব' পদটীকে 'পাণ্ডবাঃ' পদের সঙ্গে অন্বয় করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তাঁহাদের মতে—যুযুৎসবঃ মামকাঃ চ পাণ্ডবাঃ এব ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুত্রে সমবেতাঃ কিং অকুর্ব্বত এইরূপ অন্বয় হইবে। ইহার অর্থ—যুদ্ধাভিলাষী আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুতনয়রাও ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছে। ভাব এই যে, ধৃতরাষ্ট্র প্রধানতঃ নিজ পুত্রগণের এবং গৌণভাবে পাণ্ডুপুত্রগণের কার্য্যাদির কথা জানিতে চাহিয়াছেন। এরূপ অন্বয় করিলে ধৃতরাষ্ট্র যে যুদ্ধ সম্বন্ধেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদ্রূপ অনুমান করা একবারে অসঙ্গত হয় না। কাযেই প্রসঙ্গ সঙ্গতির অনুরূপ নহে বলিয়া এই অন্বয় সমর্থনযোগ্য নহে।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র অনুমোদন করেন নাই ; কারণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাণ্ডব ভীমার্জ্জুনের অতুলনীয় পরাক্রমের কথা তিনি উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন, এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধে বিজয়ের আশা তিনি কখনও পোষণ করেন নাই। কিন্তু দুর্দ্দান্ত দুর্য্যোধনকে বশে আনিতে না পারিয়াই অন্ধরাজ অবশেষে যুদ্ধে অনুমতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথাপি আস্তিক্যবুদ্ধির ফলে তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের প্রভাবে একই বংশোদ্ভব পক্ষদ্বয় এই ভয়াবহ ভ্রাতৃবিরোধ পরিহারপূর্ব্বক

পুনরায় শান্তিসংস্থাপন করিবে; কিন্তু তাহা যখন হইল না, এবং দশদিন যুদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীর ভীষ্মদেব রণে নিপতিত হওয়ার বিস্তৃত বিবরণ তিনি সঞ্জয়ের নিকট শুনিতে পাইলেন, তখনও তিনি ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব একেবারে অবিশ্বাস করিতে অসমর্থ হইয়া যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা জানিবার জন্যই সঞ্জয়কে এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন। ভাব এই যে, সঞ্জয়! যুদ্ধ তো নিবৃত্ত হইলই না; তথাপি ধর্ম্মক্ষেত্রের কিছুমাত্র প্রভাবই কোন পক্ষে পরিদৃষ্ট হয় নাই, একথা যে আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না! সুতরাং যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে উভয় পক্ষ কি করিয়াছিল, তাহা তুমি আমাকে বল। সে সময়ও ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব কিছু পরিলক্ষিত হইয়াছিল কিনা, তাহা জানাই ধৃতরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

কুরুক্ষেত্র যে ভারতের একটী পবিত্র তীর্থ, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এখনও সেজন্য শ্রাদ্ধ-দানাদি ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানকালে কুরুক্ষেত্রের নাম কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে; যথা—

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাস-পুষ্করানি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি দানকালে ভবন্তিহ॥"

জাবাল উপনিষদের শ্রুতিতে কুরুক্ষেত্রের মহিমা বিশেষভাবে পরিকীর্ত্তিত আছে; যথা—"যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্"—যেহেতু এই কুরুক্ষেত্র দেবতাদিগের দেবযজ্ঞের স্থান এবং সমস্ত প্রাণীরই ব্রহ্ম-

প্রাপ্তির আলয়স্বরূপ। শতপথ ব্রাহ্মণের শ্রুতিতেও কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে এই কথাই আছে; যথা—"কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনম্"। এজন্যই ধৃতরাষ্ট্র এখানে কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ দিয়াছেন 'ধর্ম্মক্ষেত্র'। যেখানে গেলে ক্ষেত্রের মহিমায় অধার্ম্মিকের চিত্তেও ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্রেক হয় এবং ধার্ম্মিকের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকেই বলে ধর্ম্মক্ষেত্র। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যে একান্ত অধার্ম্মিক তাহা তিনি উত্তমরূপে অবগত ছিলেন, এবং পাণ্ডবগণের ধর্ম্মবুদ্ধি সম্বন্ধেও তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। কাযেই তিনি মনে করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রের ন্যায় এমন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মস্থানে উভয়পক্ষ যুদ্ধার্থ সম্মিলিত হইলেও তাহার অধার্ম্মিক পুত্রগণের চিত্তে ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্রেক যেমন সর্ব্বথা সম্ভবপর, তেমন ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণেরও ধর্ম্মবুদ্ধি বর্দ্ধিত হওয়াতে শান্তিসংস্থাপনের আশাও সত্য সত্যই সুদূরপরাহত নহে। তথাপি শান্তি সংস্থাপিত না হইয়া যুদ্ধ হওয়াতে তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন না, কোন পক্ষের উপরই ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হইল না কেন? তাই যুদ্ধের পূর্ব্বে উভয় পক্ষের আচরণে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, তাহা জানিবার জন্যই তিনি সঞ্জয়কে পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা জানাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন।

অন্ধরাজের এইরূপ অনুমান একেবারে অমূলক নহে। সঞ্জয় তাহার প্রশ্নের যেরূপ উত্তর দিয়াছেন তাহা হইতে উভয় পক্ষের সর্ব্বপ্রধান পুরুষদ্বয়ের উপর যে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব

কিয়ৎপরিমাণে প্রস্ফুত হইয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়ই পাওয়া গিয়া থাকে। ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবেই কৌরবপতি দুর্দ্দান্ত দুর্য্যোধনের দাম্ভিকতা যে কতক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়াছিল, এবং পাণ্ডবপক্ষের অধিনায়ক মহামতি ধনঞ্জয় মিথ্যা মায়ার মোহে মুগ্ধ হওয়াতে গীতার অমূল্য উপদেশলাভে চরিতার্থ হইতে পারিয়াছিলেন, গ্রন্থারম্ভে অর্জ্জুনের অবসাদ-শীর্ষক প্রসঙ্গে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, আশা করি, পাঠক, তাহা হইতেই ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকিবেন। কাযেই এখানে আর সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক মনে করি।

গীতার এই প্রথম শ্লোকের মধ্যেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য যে গূঢ়রূপে নিহিত আছে, সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ধৃতরাষ্ট্র ভাবিয়াছিলেন, ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে উভয় পক্ষ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে, কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হইল না এবং মহাসমরে উভয় পক্ষ ভয়ঙ্কররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল; অথচ যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবও উভয় পক্ষের প্রধান পুরুষদ্বয়ের মধ্যে অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়াছে। তবে যুদ্ধ হইল কেন, ইহা কি বিশেষভাবে চিন্তনীয় নহে? গীতা ধীরভাবে আলোচনা করিলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। তথায় তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠক দেখিতে পাইবেন শ্রীভগবান বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন,—

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥"

—জ্ঞানবান মানবগণও নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্যাদিই করিয়া থাকে। প্রাণীমাত্রই প্রকৃতির অনুসরণ করিতে বাধ্য, সেজন্য তাহাদিগকে শাসন করিয়া কোনই ফল হয় না। অনেকের বিশ্বাস, জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে পরাভূত করিতে পারা যায়; এরূপ ধারণা একান্ত অযৌক্তিকও নহে, কারণ শম-দমাদি সাধনদ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দৃষ্টান্ত এদেশে প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ প্রকৃতি অতিক্রম করিতে না পারিলে যখন পরপুরুষে প্রবেশলাভ অসম্ভব, তখন পরমপদ লাভ করিতে হইলে জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে প্রতিহত করা অবশ্যই অসম্ভব নহে। সুতরাং উল্লিখিত ভগবদ্বাক্যে সাধারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি-গণকে লক্ষ্য করিয়াই 'জ্ঞানবান্' পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে; তত্ত্বজ্ঞানী বোধ হয় উক্ত পদের লক্ষ্যীভূত নহে। তার পর, প্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষেও সম্ভবপর কিনা, সেবিষয়েও সন্দেহ আছে; কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা প্রকৃতির প্রবাহে বাধা দেওয়া সর্ব্বথা সম্ভবপর হইলেও তৎফলে প্রকৃতি একেবারে বিলুপ্ত হয় না। সেজন্য যাহারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাদিগকেও সময় সময় মানসিক বিকারের অধীন হইতে দেখা গিয়া থাকে। এজন্যই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৯ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন,—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥

—আহারাদিবর্জ্জন দ্বারা কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সমূহ ঐরূপ ব্যক্তির দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়ের প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হইতে পারে বটে; কিন্তু তৎফলে তাহার বাসনার বিলোপ ঘটে না। একমাত্র পরমার্থদর্শী ও স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্মযোগীরই ঐরূপ বাসনা বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বাসনা বিলুপ্ত না হইলেও বহিরিন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া যাহারা মনে মনে ঐসকল বিষয় স্মরণ করে তৃতীয় অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে ভগবান্ তাহাদিগকে মিথ্যাচার বা ভণ্ড বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন; যথা—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

—কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিয়া যে ব্যক্তি উহাদের ভোগ্য বিষয়সমূহ মনে মনে স্মরণ করে, তাহাকে মিথ্যাচার বলা হইয়া থাকে; শুধু ইহাই নহে, প্রকৃতির প্রভাবে প্রাণীমাত্রই যে অবশভাবে তদনুরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হয় এবং মোহবশতঃ প্রকৃতির অন্যথাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও পরে যে প্রকৃতির অনুসরণ না করিয়া উপায় নাই, অর্জ্জুনকে নানা উপদেশ দিয়াও তাঁহার ক্ষাত্রপ্রকৃতির অনুরূপ যুদ্ধকার্য্যে পুনঃ প্রবৃত্ত করিতে না পারিয়া শ্রীভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬০ শ্লোকে গীতার উপসংহারকালে সেকথা দৃঢ়তার সহিত নির্দ্দেশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই; যথা—

'স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥"

হে কৌন্তেয়! তুমি তোমার স্বাভাবিক ক্ষাত্রপ্রকৃতির অনুরূপ স্বকীয় পূর্ব্বকর্ম্ম দ্বারা এমন আবদ্ধ রহিয়াছ যে, এখন মোহবশতঃ তুমি তোমার সেই প্রকৃতির অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করিলেও, পরে নিতান্ত পরতন্ত্রের ন্যায়ই তাহা করিতে বাধ্য হইবে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯ শ্লোকেই শ্রীভগবান বজ্রগম্ভীরস্বরে অর্জ্জুনকে স্বকীয় প্রকৃতির অনুরূপ যুদ্ধকার্য্য ত্যাগ করার জন্য তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন,—

"যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥"

অর্জ্জুন তুমি অহঙ্কারের উন্মাদনায় "যুদ্ধ করিব না" বলিয়া এই যে ইচ্ছা করিতেছ, তোমার এই সঙ্কল্প একেবারে বৃথা; কারণ তোমার ক্ষাত্রপ্রকৃতি তোমাকে নিশ্চয়ই যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে। প্রকৃতির প্রভাব প্রতিরোধ করার সাধ্য যে কাহারও নাই, এই ভগবদ্বাক্য দ্বারা তাহা অবিসম্বাদিতরূপেই প্রমাণিত হইয়া থাকে। সুতরাং গীতার মতে প্রকৃতির প্রভাব যে অপরিহার্য্য, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ইচ্ছা না থাকিলেও অনেক সময় অনেক কার্য্যই করিতে হয়, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। সে সকল ক্ষেত্রে প্রকৃতি যেন ঘাড়ে ধরিয়াই কার্য্য করাইয়া থাকেন। এরূপ অবস্থা উপলক্ষ্য করিয়াই তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥

—হে বৃষ্ণীবংশপ্রদীপ! অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুরুষ কাহা কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া বলপূর্ব্বক নিযুক্ত ব্যক্তির ন্যায় পাপাচরণ করিতে বাধ্য হয়?

প্রকৃতির প্রভাব যখন অতিক্রম করিবার উপায় নাই. তখন সেজন্য অনর্থক শক্তি ও সময় নষ্ট না করিয়া প্রকৃতির অনুরূপ আচরণ করিলে যদি পরমার্থলাভ হয়, তবে তদ্রূপ করাই যে সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অণুমাত্র অবসর আছে কি? সাধারণতঃ লোকে মনে করে, প্রকৃতি পুরুষকে অধঃপাতের দিকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং এই বিশ্বাসবশেই প্রকৃতি প্রতিরোধ করিতে সকলে যত্নবান হয়। ধর্ম্ম-জগতে এই মতবাদ যে অতি প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেকথা সকলেই অবগত আছেন। এই মতমূলেই সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাস সমর্থিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই মত গীতার বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত নহে; তিনি বলেন, মানবগণ প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া অধঃপতিত হয় না, তাহারা অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া আপনাকে কর্ত্তা মনে করাতেই কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত রাখিতে হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রকৃতির বিধানে যখন যে কর্ম্ম উপস্থিত হইবে, ফলকামন-বর্জ্জনপূর্ব্বক বশীকৃতচিত্তে ও ভগবানে অর্পণ-বুদ্ধিতে তাহাই সম্পাদন করিতে হইবে। তাই দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬৪ শ্লোকে তিনি দৃঢ়তার সহিতেই বলিয়াছেন;—

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥

—সংযতচিত্ত ব্যক্তি নিজের বশীভূত, এবং অনুরাগ ও বিরাগ-বর্জ্জিত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকে। পরবর্ত্তী শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, এই আত্ম-প্রসাদের ফলেই তাহার সমস্ত দুঃখ দূর হয়, এবং এরূপ প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি স্থিতিলাভ করায় সে স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া থাকে। এই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষই যে ব্রাহ্মীস্থিতিতে নির্ব্বাণলাভে সমর্থ হয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে তাহা ভগবান নিঃসংশয়িতরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতির গতি প্রতিরোধ না করিয়া উহারই অনুসরণপূর্ব্বক রাগদ্বেষবিহীন ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেই মোক্ষলাভ হয়, ইহাই গীতার স্থির সিদ্ধান্ত। এজন্যই ভগবান অর্জ্জুনকে যুদ্ধে পুনরায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত গীতায় বহু প্রকার উপদেশ দিয়াছেন। অনাসক্তভাবে যন্ত্রের ন্যায় প্রকৃতির অনুসরণই যে গীতার উপদেশের সার মর্ম্ম, এবং ঐরূপ করিলেই যে গীতার বক্তার মতে মোক্ষলাভ হয়, স্থিরচিত্তে গীতা পাঠ করিলে সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন।

জীবের উপর প্রকৃতির প্রভাব এরূপ প্রবল বলিয়াই ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের মহিমায় দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলেও উহা কার্য্যকরী হয় নাই। উভয়েরই নিজ ক্ষাত্র প্রকৃতি তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছে। বস্তুতঃ

প্রকৃতির গুণেই যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং মানুষ অহঙ্কারে আত্মহারা হইয়া আপনাকে অযথা কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে ভগবান তাহা স্পষ্টবাক্যে বলিয়া দিয়াছেন ; যথা—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে ॥"

অন্ধরাজ প্রকৃতির এই তত্ত্ব সম্ভবতঃ অবগত ছিলেন না ; তাই তিনি ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমায়ই শান্তি সংস্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব বুঝিবার জন্য প্রশ্ন করাতেই সঞ্জয় তাহার উত্তর দিতে যাইয়া যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপারের বর্ণন করিয়াছেন ; ইহাই ভগবদ্গীতা। ধৃতরাষ্ট্র ঐরূপ প্রশ্ন না করিলে হয়তো গীতার উপদেশ প্রদত্তই হইত না ; সুতরাং অন্ধরাজের এই প্রশ্নের নিমিত্তই যে গীতার অবতারণা হইয়াছে, একথা অবাধেই বলা যাইতে পারে। কাযেই এই প্রশ্নকেই গীতার ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করা অসঙ্গত নহে।

যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষবধে প্রবৃত্ত হইয়াও মায়ার মোহেই যে অর্জ্জুন যুদ্ধবিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন, গীতার প্রথম অধ্যায়েই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। এই মায়া ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে বা ভগবদিচ্ছায়ই অর্জ্জুনের উপর এরূপ প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ; তাহা না হইলে অর্জ্জুনের ন্যায় পুরুষপ্রবরের অকস্মাৎ এরূপ চিত্তবিভ্রম সংঘটিত হইতে পারিত না। কিন্তু অর্জ্জুনের এই মোহমুগ্ধতাও তাঁহার

পক্ষে পরমকল্যাণকরই হইয়াছিল; নচেৎ গীতামৃত-পানের সৌভাগ্য তাঁহার কখনও ঘটিত কিনা, সন্দেহ। কাযেই অর্জ্জুনের এরূপ চিত্তবিভ্রমও যে ধর্ম্মক্ষেত্রেরই মহিমাজ্ঞাপক, তাহা সম্ভবতঃ সকলেই স্বীকার করিবেন।

কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমায় সত্ত্বগুণ চিত্তে উদ্রিক্ত হওয়াতেই অর্জ্জুন হত্যাকাণ্ডের অনৌচিত্য উপলব্ধি করিয়া যুদ্ধ-বিমুখ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অধ্যায়ের বর্ণনায়ই পাঠক দেখিতে পাইবেন, অর্জ্জুন নিজেই বলিয়াছেন, স্বজনবর্গের প্রতি মমতা-বশেই তিনি যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেছেন। স্বজনের প্রতি মমতা কখনই সত্ত্বগুণের পরিচায়ক নহে। অর্জ্জুন যদি জীবহত্যার আশঙ্কায় যুদ্ধবিমুখ হইতেন, তাহা হইলে সত্ত্বগুণের কথা উঠিতে পারিত। যাহা হউক, ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবেই যে অর্জ্জুনের এই মোহও পরম কল্যাণের কারণ হইয়াছিল, সেকথা স্বীকার করিতেই হইবে। কাযেই গীতার এই প্রথম শ্লোকের প্রথম পদ 'ধর্ম্মক্ষেত্রে'র মধ্যেই যে গীতার তত্ত্ব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, একথা বলিলে বোধ হয় কোনই দোষ হয় না।

গতিমূলক শক্তিতেই প্রকৃতি অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং অনুক্ষণ অবিরাম গতিতে অগ্রসর হওয়াই গতির ধর্ম্ম। প্রকৃতির প্রভাবেই সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে, জীব স্বকীয় স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া উত্তরোত্তর সরিয়া যায়, এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির ক্রিয়ায় স্বকীয় কর্ত্তৃত্বাভিমান পোষণপূর্ব্বক সংসারচক্রে বিঘূর্ণিত হইতে থাকে। সতত

সরাইয়া নেয় বলিয়াই প্রকৃতির এই লীলার সংসার-নাম সার্থক ; এবং চক্রে গতির বিরাম কোন কালেও সংঘটিত হয় না বলিয়া ইহাকে বলা হয় সংসার-চক্র। এই অব্যাহত গতি হইতে জীবকে যে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ, তাহারই নাম ধর্ম্ম—"ধরতি যঃ" অথবা "ধ্রিয়তে যেন স ধর্ম্মঃ।" প্রকৃতির প্রভাবে যে নিত্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, ধর্ম্ম জীবকে ঐ পরিবর্ত্তনের সহিত সম্মিলিত হইতে না দিয়া এক নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে আবদ্ধ রাখে ; সেই নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য হইতেছে নিম্নস্তরে দেবতাদি শক্তিমান বিগ্রহ, মধ্যস্তরে ভগবদ্‌বিগ্রহ এবং শেষস্তরে পরম ব্রহ্ম। ধর্ম্মের গুণে জীব আপনাকে একবার প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে সমর্থ হইলেই ক্রমে ক্রমে শক্তিসম্পন্ন হইয়া অবশেষে স্বকীয় স্বরূপানুভূতি করিতে সমর্থ হয়, এবং তৎফলে কৈবল্যলাভ করে। প্রকৃতিকে প্রতিরোধ করার শক্তি যখন কাহারও নাই, তখন গীতায় শ্রীভগবান কর্ম্মযোগের যে প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন তদনুসারে কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিহারপূর্ব্বক প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই যে সংসারচক্র হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায়, এবং আত্মকল্যাণকামীর প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা অবিসম্বাদিত—"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" এই শাস্ত্রোপদেশ অনুসরণপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলেই কর্ম্মবন্ধন হইতে অব্যাহতিলাভ করা যায়। অর্জ্জুন ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাবে মোহমুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম ত্যাগ করিতে অভিলাষী হওয়াতেই শ্রীভগবান তাঁহার ঐরূপ

অভিপ্রায়ের ব্যর্থতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্যই গীতায় বহুবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, দশদিন কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গীতার অবতারণা করিলেও, গীতার পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীমৎ আনন্দগিরি মহারাজ এবং শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহারাজ তাঁহাদের টীকায় অন্ধরাজের এই প্রশ্নের এক অদ্ভুত কারণ কল্পনা করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের কারণরূপে গিরি মহারাজ ২য় শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে লিখিতেছেন,—

"কিমস্মদীয়ং প্রবলং বলং প্রতিলভ্য ধীরপুরুষৈর্ভীষ্মাদিভিরধিষ্ঠিতং পরেষাং ভয়মাবিরভূৎ যদ্বা পক্ষদ্বয়হিংসানিমিত্তাধর্ম্মভয়মাসীদ্ যেন এতে যুদ্ধাদুপরমেরন্নিতি এবং পুত্রপরবশস্য পুত্রস্নেহাভিনিবিষ্টস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রশ্নে সঞ্জয়স্য প্রতি বচনম্।"

—ভীষ্মাদি অসাধারণ প্রাজ্ঞপুরুষগণ-সংরক্ষিত আমাদের পক্ষের প্রবল সৈন্যদল দেখিয়া পাণ্ডবগণের চিত্তে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে কি, অথবা উভয়পক্ষের চিত্তে এই হিংসাজনিত অধর্ম্মের ভয় উদ্রিক্ত হওয়াতে উহারা কি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে? এইরূপ উদ্দেশ্যে পুত্রস্নেহাভিভূত ধৃতরাষ্ট্র প্রথম শ্লোকে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, সঞ্জয় দ্বিতীয় শ্লোকে তাহারই উত্তর দিতেছেন।
দশদিন প্রচণ্ড পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া ভীষ্ম শরশয্যায় নিপতিত হইলে, সঞ্জয় যখন অন্ধরাজকে ভীষ্মের পতনসংবাদ জানাইলেন,

তখন বহুপ্রকার বিলাপ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের পতন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সঞ্জয়ের মুখে শ্রবণ করার পর সঞ্জয়কে গীতার প্রথম শ্লোকে বর্ণিত প্রশ্ন করিয়াছেন। সুতরাং ঐরূপ প্রশ্ন করিবার সময় ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব গিরি মহারাজের বর্ণনানুরূপ ছিল, এরূপ কল্পনা যে একান্তই অস্বাভাবিক ও অসম্ভব, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না।

শ্রীমৎ সরস্বতী মহারাজও গিরিজীর অনুমানই অনুসরণ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হ'ন নাই। তাই তিনি লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে যুযুৎসবো যুদ্ধমিচ্ছবোঽপিসন্তঃ কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ সঙ্গতাঃ মামকা মদীয়া দুর্যোধনাদয়ঃ পাণ্ডবাশ্চ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ কিমকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ। কিং পূর্ব্বোৎসাহভূত যুযুৎসানুসারেণ যুদ্ধমেব কৃতবন্তঃ উতকেনচিন্নিমিত্তেন যুযুৎসা নিবৃত্ত্যাঽন্যদেবকিং কৃতবন্তঃ। ভীমার্জ্জুনাদি-বীরপুরুষনিমিত্তং দৃষ্টভয়ং যুযুৎসানিবৃত্তিকারণং প্রসিদ্ধমেব অদৃষ্টভয়মপি দর্শয়িতুমাহ ধর্ম্মক্ষেত্রইতি। * * * * তস্মিন্ গতাঃ পাণ্ডবাঃ পূর্ব্বমেব ধার্ম্মিকা যদি পক্ষদ্বয়হিংসানিমিত্তাদ্ধর্ম্মাদ্ভীতা নিবর্ত্তেরং স্ততঃ প্রাপ্তরাজ্যা এব মৎপুত্রাঃ' অথবা ধর্ম্মক্ষেত্রমাহাত্ম্যেন পাপীনামপি মৎপুত্রাণাং কদাচিচ্চিত্তপ্রসাদঃ স্যাত্তদা চ তে লুপ্তাঃ কপটোপাত্তং রাজ্যং পাণ্ডবেভ্যোঃ যদি দদ্যুস্তর্হি বিনাপি যুদ্ধং হত এবেতি স্বপুত্ররাজ্যলাভে চ দৃঢ়তরমুপায়ং লপ্স্যো ইতি—"

পূর্ব্বে যুদ্ধ করিতে অভিলাষী আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুর তনয়গণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছে? তাহাদের পূর্ব্ব অভিলাষ অনুসারে তাহারা কি যুদ্ধই করিয়াছে, অথবা অন্য কোন কারণে যুদ্ধাভিলাষ নিবৃত্ত হওয়াতে, তাহারা অন্য কিছু

করিয়াছে? ভীষ্মার্জ্জুনাদির ভয়ে যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া যেমন সর্ব্বথা সম্ভবপর, তেমন যুদ্ধ বিরতির নিমিত্ত অদৃষ্টভয়ও যে আছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই 'ধর্ম্মক্ষেত্রে' ইত্যাদি বলা হইয়াছে। সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে গমন করাতে পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ উভয় পক্ষের মধ্যে হিংসাজনিত অধর্ম্মের ভয়ে যদি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পুত্রগণের রাজ্য অক্ষুণ্ণই থাকিবে; অথবা ধর্ম্মক্ষেত্রের মহিমায় আমার পাপাশয় পুত্রগণ অকস্মাৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া যদি তাহাদের কপটতামূলে অর্জ্জিত রাজ্য পাণ্ডবগণকে প্রত্যর্পণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারাতো বিনাযুদ্ধেই একরূপ নিহত হইয়াছে। অতএব নিজ পুত্রগণের রাজ্যলাভের নিমিত্ত দৃঢ়তর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

সরস্বতী মহারাজের এই অদ্ভুত পরিকল্পনা পাঠ করিলে সম্ভবতঃ সকলেই মনে করিবেন, তিনি এই সকল কথা লিখিবার সময় মহাভারতের বৃত্তান্ত একেবারে বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন! যেভাবে মহাভারতে গীতার সন্নিবেশ হইয়াছে, তাহা অবিদিত না থাকিলে এরূপ কল্পনা কখনও চিত্তে স্থান পাইতে পারে না। উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠকগণ পূজ্যপাদ টীকাকার-দ্বয়ের উক্তির অলীকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

ধৃতরাষ্ট্র চরমুখে প্রত্যহই যুদ্ধের সংবাদ পাইতেন, এরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে। তার পর, মহর্ষি বেদব্যাসের বরে

যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনা অন্ধরাজকে ঐ দিনই অবিলম্বে জানাইবার জন্য সঞ্জয় যে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্তও মহাভারতে বর্ণিত আছে। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের সংবাদ প্রতিদিন জানিতে পারেন নাই, এরূপ অনুমান একান্তই অসম্ভব। এ অবস্থায় পূজ্যপাদ গিরি ও সরস্বতী মহারাজ অন্ধরাজের উল্লিখিতরূপ অভিপ্রায় অনুমান করিলেন কিরূপে, তাহা বস্তুতঃই বোধগম্য নহে!

অন্ধরাজের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়া সঞ্জয় বলিতেছেন,—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসংগম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২।
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩।

—সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যগণকে ব্যূহবদ্ধ দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের সমীপে গমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন —আচার্য্যদেব! আপনার ধীমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র কর্ত্তৃক ব্যূহবদ্ধ পাণ্ডবগণের ঐ বিশাল সৈন্যসমাবেশ দর্শন করুন। কৌরবরাজের এই উক্তিতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ দাম্ভিকতার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যে দুর্য্যোধন চিরদিনই পাণ্ডবগণকে নিতান্ত নগণ্যের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, এবং তাঁহাদের ধ্বংস-সাধনের নিমিত্ত বহুসংখ্যক প্রবলপরাক্রান্ত বীরসমন্বিত একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি পাণ্ডবগণের সপ্ত

অক্ষৌহিণী মাত্র সৈন্যসমাবেশ-দর্শনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া দ্রুতগতিতে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যের মহিমাবর্ণনে প্রবৃত্ত হইবেন, ইহা বস্তুতঃই বিস্ময়াবহ নহে কি! পাঠক দেখিতেছেন, দুর্য্যোধন পাণ্ডব সৈন্যদলকে "মহতীং চমূম্" বলিয়া আচার্য্যকে উহা দেখাইতেছেন। দুর্য্যোধনের চিত্তে যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে, এই 'মহতী' বিশেষণ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে; তাহা না হইলে তিনি একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি হইয়া পাণ্ডবগণের সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যকে 'মহতীং' বলিয়া বর্ণন করিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন। দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করাতেও দুর্য্যোধনের ভীতিবিহ্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলে আচার্য্যকে ডাকাইয়াও আনিতে পারিতেন, কিন্তু পাণ্ডবগণের উচ্ছেদসাধনার্থ আচার্য্যের প্রসন্নতা-বিধানই এখন একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া তিনি নিজেই তাঁহার সমীপে গমন করিয়াছেন।

দুর্য্যোধনের এই ভীতি যে তাঁহার গর্ব্ব কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব হওয়ারই পরিচায়ক, তাহা বোধ হয় বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক। ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব ব্যতীত দুর্য্যোধনের এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের অন্য কোন যুক্তিযুক্ত কারণই অনুমিত হইতে পারে না। গীতার পূজ্যপাদ টীকাকারগণ মধ্যে কেহ কেহ গীতার এই তৃতীয় শ্লোকে দ্রোণাচার্য্যের প্রতি দুর্য্যোধনের ব্যঙ্গোক্তির ইঙ্গিত থাকিতে পারে বলিয়াও ব্যাখ্যা

করিয়াছেন। ইহাদের মতে দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে বলিতেছেন, —হে 'পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য' (পাণ্ডুপুত্রগণেরই শিক্ষাগুরু)! ধীমতা (বিচক্ষণ) তব শিষ্যেণ (আপনার শিষ্য) দ্রুপদপুত্রেন (দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক) ব্যূঢ়াং (বূহবদ্ধ) মহতীং চমূম্ (বিশাল সৈন্যদল) পশ্য (অবলোকন করুন)। ভাব এই যে, আপনি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের আচার্য্য হইলেও পাণ্ডবগণকে যখন সমধিক স্নেহ করিয়া থাকেন, তখন আপনাকে তাহাদের আচার্য্য বলাই উচিত। আপনার পরম স্নেহভাজন সেই পাণ্ডবগণ অপর বিচক্ষণ শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্নের সহায়তায় আপনারই বধের নিমিত্ত কি অপূর্ব্ব ব্যূহ রচনা করিয়াছে, তাহা ভাল করিয়া দেখুন! আচার্য্যকে উপহাস করাই যে দুর্য্যোধনের অভিপ্রেত উল্লিখিত অর্থ হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু শ্লোকের এরূপ অর্থ যে গীতার ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা বলাই বাহুল্য; কারণ 'মহতীং চমূম্' কথার সহিত 'পাণ্ডুপুত্রাণাম্' পদের সম্বন্ধই সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। 'আচার্য্য' পদের সহিত যদি 'পাণ্ডুপুত্রাণাম্' পদের সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে 'মহতীং চমূম্' হইবে কাহার? তার পর, পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে দুর্য্যোধনের যেরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তিনি যে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের ভয়ে একান্ত আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় অস্বীকার করা একরূপ অসম্ভব। কাযেই দুর্য্যোধনের এইরূপ বিদ্রূপের কথা একেবারে অমূলক বলিয়া উপেক্ষাযোগ্য।

পাণ্ডব সৈন্য দেখিয়া দুর্য্যোধন কিরূপ বিকম্পিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, চতুর্থ হইতে দশম শ্লোকে বর্ণিত তাহার উক্তিতেই উহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ৪।৫।৬ শ্লোকে তিনি নিম্নলিখিতরূপে পাণ্ডবপক্ষের বীরবর্গের নামোল্লেখ করিয়াছেন,—

অত্র শূরা মহেম্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪।
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫।
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬।

পাঠক দেখিবেন চতুর্থ শ্লোকে দুর্য্যোধন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরবর্গকে 'মহেম্বাসা' ও 'ভীমার্জ্জুনসম' তো বলিয়াছেনই,— পরন্তু তৎপর একে একে পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধান প্রধান পুরুষগণের নাম নানা বিশেষণ-যুক্ত করিয়াও অবশেষে তাঁহাদের সকলকেই তিনি 'মহারথ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। 'মহেম্বাসাঃ' পদের অর্থ মহাধনুর্ধর; সেকালে ধনুর্ব্বাণের যুদ্ধই প্রধানতঃ প্রচলিত ছিল বলিয়া মহাধনুর্ধর বলিলে যে অতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধাকেই বুঝাইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তার পর, এই বীরগণকে দুর্য্যোধন সেকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ভীম ও অর্জ্জুনের সমকক্ষ বলিয়াছেন। ভীমার্জ্জুন পরাক্রমে সকল বীরের শীর্ষস্থানীয় হইলেও এতদিন দুর্য্যোধন সেকথা কখনও স্বীকার করেন নাই; কর্ণকেই তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর মনে করিতেন, এবং তাহার সহায়তায় পাণ্ডবগণের উচ্ছেদ-

সাধনে সমর্থ হইবেন এই বিশ্বাসই তাঁহার ছিল। কিন্তু চতুর্থ শ্লোকে **'ভীমার্জ্জুনসমা'** বলাতে ইহাই অসংশয়িতরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, তিনি ভীমার্জ্জুনকে সেকালের শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। অবশ্যই ৪–৬ শ্লোকে তিনি পাণ্ডবপক্ষীয় যেসকল বীরের নাম করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই যে ভীমার্জ্জুনের সমকক্ষ যোদ্ধা নহেন, সকলেই সম্ভবতঃ সেকথা অবগত আছেন। কিন্তু দুর্য্যোধন ভয়াকুলতা নিবন্ধন সকলকেই ভীমার্জ্জুন-সদৃশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাণ্ডবপক্ষের যে সকল বীরের নাম তিনি করিয়াছেন, তাহারা সকলেই যুদ্ধ-বিশারদ সন্দেহ নাই ; কিন্তু এতদিন অহঙ্কারে অন্ধীভূত থাকিয়া দুর্য্যোধন সে সকলকে কিছুমাত্র গণ্য করেন নাই। এখন তাহার নিকট পূর্ব্বে নগণ্য সে সকল বীরকেই তিনি **'মহেষ্বাসাঃ'**, **'ভীমার্জ্জুনসমাঃ'**, **'মহারথাঃ'** তো বলিয়াছেনই, অধিকন্তু বিভিন্ন বীরের নামোল্লেখ কালে তিনি **'মহারথঃ'** ; **'বীর্য্যবান্'**, **'নরপুঙ্গবঃ'**, **'বিক্রান্তঃ'** প্রভৃতি বিশেষণ যোগ করিতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই! ইহা যদি দুর্য্যোধনের ভাবান্তরের পরিচায়ক না হয়, তবে এসকল উক্তি কিরূপে সমর্থন করা যাইতে পারে, তাহা বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই।

পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরবর্গের সম্বন্ধেতো এই কথা ; তার পর, নিজ পক্ষের পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে দুর্য্যোধন বলিতেছেন,—

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮।
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯।

—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ আমাদের পক্ষে যে সকল বিশিষ্ট বীর আমার সেনানায়ক হইয়াছেন তাহাদিগের কথাও আপনি শ্রবণ করুন; আপনার অবগতির নিমিত্ত সে সকল বীরের নাম আমি বলিতেছি। সমরবিজয়ী আপনি, ভীষ্মদেব, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ; আমাদের পক্ষে ইহাদের নামই উল্লেখযোগ্য এতদ্ব্যতীত আরও নানা অস্ত্র-শস্ত্রধারী বহু বীর আমার জন্য জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে; তাহারাও সকলে যুদ্ধবিশারদ। বলা বাহুল্য, কৌরববাহিনীর বিষয় দ্রোণাচার্য্যের অজ্ঞাত ছিল না, তথাপি দুর্য্যোধন নিজ পক্ষের সেনানায়কগণের নাম এভাবে উল্লেখ করাতে, ইহাই অবাধে অনুমিত হইতে পারে যে, তিনি পাণ্ডবপক্ষের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক আত্মরক্ষার নিমিত্ত আচার্য্যের অনুগ্রহলাভের আশায়ই এইরূপ করিয়া থাকিবেন, যাহা হউক এই শ্লোকে "দ্বিজোত্তম" সম্বোধনেও টিকাকারগণের কেহ কেহ ব্যঙ্গের আভাষ পাইয়াছেন; ইহাও যে ভ্রান্তিমুলক তাহা বোধ হয় বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। দুর্য্যোধন নিজ পক্ষের মাত্র ৮ জন বীরেরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন; পক্ষান্তরে পাণ্ডবপক্ষের ১৭ জন বীরের নাম

করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। এতদ্ব্যতীত নিজপক্ষীয় বীরগণ সম্বন্ধে কেবল 'সমিতিঞ্জয়ঃ' ও 'যুদ্ধবিশারদাঃ' বলিয়াই তিনি নিরস্ত হইলেও অম্লানবদনে পাণ্ডব-পক্ষের বীরবর্গকে বহু বিশেষণেই ভূষিত করিয়াছেন! ইহাতেও তাহার ভীতির ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শুধু ইহাই নহে; অতঃপর দুর্য্যোধন উভয় সৈন্যদল সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০।

—ভীষ্মদেব কর্তৃক সংরক্ষিত আমাদের এই সৈন্যবল পাণ্ডব সৈন্যের সহিত যুদ্ধে অপ্রচুর বা অসমর্থ বলিয়াই অনুমিত হইতেছে, পরন্তু ভীমসেন কর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডব সৈন্য যে আমাদের সৈন্যগণের তুলনায় অপরিমিত, এবং তাহাদের ধ্বংসসাধনে সম্পূর্ণ সমর্থ, ইহাই আমার বিশ্বাস। ভীতি-বিহ্বলতার অধিকতর পরিচয় এতদপেক্ষা আর কি হইতে পারে। দুর্য্যোধন ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণাদি অসাধারণ বীরবর্গসমন্বিত স্বকীয় একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য-দলকেও পাণ্ডব-পক্ষের সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ মনে করিতেছেন! ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব ব্যতীত অন্য কি কারণে সহসা এভাবে দুর্য্যোধনের দাম্ভিকতা দমিত হইতে পারে, তাহা সুধী পাঠকগণই ভাবিয়া দেখিবেন।

অতিশয় পরিতাপের বিষয়, গীতার পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীমৎ আনন্দগিরি ও শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী মহারাজদ্বয় ১০ম

শ্লোকস্থিত 'অপর্য্যাপ্তম্' ও 'পর্য্যাপ্তম্' এই পদদ্বয়ের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্লোকের তাৎপর্য্যাবধারণে বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন। ইহাদের মতে 'অপর্য্যাপ্তম্' পদের অর্থ অপরিমিত—পাণ্ডব সৈন্যের দলনে সম্পূর্ণ সমর্থ, এবং 'পর্য্যাপ্তম্' পদের অর্থ পরিমিত—কুরুসৈন্যের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ। সুতরাং ইহারা শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই যে, ভীষ্মের মত অদ্বিতীয় বীরবর কর্ত্তৃক সংরক্ষিত অপরিমিত কুরুসৈন্যের পক্ষে পাণ্ডব সৈন্যের উচ্ছেদসাধন সহজসাধ্য; পরন্তু চঞ্চলমতি ভীমসেন কর্ত্তৃক রক্ষিত পরিমিত বা স্বল্পসংখ্যক পাণ্ডব সৈন্য কুরুসৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইতেও সমর্থ নহে। কথিত বাঙ্গালা ভাষায় অবশ্যই 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দ ভ্রান্তিবশে অপরিমিত অর্থে সময় সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু বিশুদ্ধ ভাষায়, বিশেষতঃ সংস্কৃতে, অপর্য্যাপ্ত শব্দ যে অপ্রচুর বা অল্প অর্থে এবং পর্য্যাপ্ত শব্দ প্রচুর বা যথেষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রই তাহা উত্তমরূপে অবগত আছেন। এ অবস্থায় গিরি ও সরস্বতী মহারাজদ্বয়ের ন্যায় মনীষী ব্যক্তিরা এরূপ ভ্রমে নিপতিত হইলেন কিরূপে, তাহা বুঝিয়া উঠা বস্তুতঃই কঠিন। যাহা হউক আতঙ্কে অধীর হইয়াই যে রাজা দুর্য্যোধন অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পাণ্ডব সৈন্যদলকে অধিকতর প্রবল মনে করিয়াছেন, সেবিষয়ে সম্ভবতঃ সংশয়ের অণুমাত্রও অবসর নাই। অহঙ্কারের অভাবই এইরূপ আতঙ্কের মূলীভূত।

কৌরব পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী ও পাণ্ডব পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া যে বর্ণিত আছে, আমাদের গণনামতে তাহার সংখ্যা কত পাঠক-বর্গের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে তাহার উল্লেখ করাও আবশ্যক মনে করি। মহাভারতের আদিপর্ব্বে এই অক্ষৌহিণীর একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বর্ণিত আছে। তাহাতে দেখা যায়, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব ও ১০৯৩৫০ পদাতি সর্ব্বসমেত ২১৮৭০০ সংখ্যক সৈন্যদ্বারা এক অক্ষৌহিণী গঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং কৌরব পক্ষের একাদশ অক্ষৌহিণীতে যে ২৪০৫৭০ হস্তী, ২৪০৫৭০ রথ, ৭২১৭১০ অশ্ব ও ১২০২৮৫০ পদাতি, সর্ব্বসমেত ২৪০৫৭০০ সৈন্য, এবং পাণ্ডব-পক্ষের সপ্ত অক্ষৌহিণীতে ১৫৩০৯০ হস্তী, ১৫৩০৯০ রথ, ৪৫৯২৭০ অশ্ব ও ৭৬৫৪৫০ পদাতি, সর্ব্বসমেত ১৫৩০৯০০ সৈন্য ছিল, তাহা সহজবোধ্য। এই হিসাব অনুসারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উভয়পক্ষে ৩৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬ শত সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। এই হিসাবে কেবল যোদ্ধৃ-বর্গের সংখ্যাই দেওয়া আছে ; কিন্তু প্রত্যেক হস্তী রথ ও অশ্বের সঙ্গে আরও কয়েকজন সৈন্য থাকিত। সুতরাং সকলের সংখ্যা যে উপরে প্রদত্ত হিসাব অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, একথা অবাধেই বলা যাইতে পারে। তার পর, মহাভারতের অন্যান্য স্থানে যে বর্ণনা আছে, এবং যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র নিহত ব্যক্তিদের ও রাজা যুধিষ্ঠির হতাবশিষ্টগণের সংখ্যা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি অবিশ্বাস করা না যায়,

তবে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে নিযুক্ত সৈন্যের সংখ্যা যে কয়েক কোটি হইবে, সে সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। মহাভারতে বর্ণিত আছে, পঞ্চনদ প্রদেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ উভয় পক্ষের শিবিরসমূহে পরিব্যপ্ত হইয়াছিল, ইহা হইতেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সৈন্যসংখ্যা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমিত হইতে পারে। যাহা হউক উপরে যে সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইলেও বর্ত্তমান সময়ের কোন মহাসমরেই যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমান সংখ্যক সৈন্য যোগদান করে নাই, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। রাজা দুর্যোধন এত অধিক সৈন্যবল সত্ত্বেও পাণ্ডব-পক্ষের ভয়ে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন কেন, গীতার ১ম শ্লোকস্থিত ১ম পদ 'ধর্ম্মক্ষেত্রে'র মধ্যে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা ব্যতীত গত্যন্তর কোথায়?

কথা উঠিতে পারে, দুর্য্যোধন যদি সত্য সত্যই আতঙ্কান্বিত হইয়া থাকিবেন, তবে তিনি কৌরব পক্ষের প্রধান সেনানায়ক ভীষ্মদেবের নিকট গমন না করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট গেলেন কেন? মহাভারতের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, ভীষ্ম এবং দ্রোণ উভয়ই পাণ্ডবগণকে সমধিক স্নেহ করিতেন; কিন্তু মহামতি ভীষ্মদেব যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কুরুসৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি যে প্রাণপণে তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালন করিবেন, সে সম্বন্ধে দুর্য্যোধনের বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিল না। কারণ সেকালে ভীষ্ম সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া সকলের অশেষ

শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য্য যদি পাণ্ডবগণের, বিশেষতঃ পাণ্ডব-পক্ষের নায়ক অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ তেমন আগ্রহভরে যুদ্ধ না করেন সেই আশঙ্কায়, তদুপরি রণ-কৌশলে সে সময় দ্রোণাচার্য্য অদ্বিতীয় ছিলেন বলিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ আকর্ষণের নিমিত্তই দুর্য্যোধন ভীষ্মের নিকট না যাইয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট গিয়াছিলেন। রণকৌশলে যিনি অদ্বিতীয় তিনি যদি পাণ্ডব-পক্ষের ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হ'ন, তাহা হইলেই দুর্য্যোধনের আতঙ্ক অন্তর্হিত হইতে পারে। তাই তিনি আচার্য্যের নিকট যাইয়া উভয় পক্ষের অবস্থা বর্ণনপূর্ব্বক নিজ পক্ষ নিরাপদে রক্ষার ভার গ্রহণের নিমিত্ত তাহার নিকট নিম্নলিখিতরূপ প্রার্থনা জানাইতেছেন,—

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১।

—আচার্য্য দেব! উভয় পক্ষের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন আপনারা সকলে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানসমূহে সাবধানে অবস্থান পূর্ব্বক ভীষ্মদেবকে রক্ষা করিতে যত্নবান হউন। ভাব এই যে, ভীষ্মদেব প্রতিদিন পাণ্ডব-পক্ষের বহু সহস্র প্রধান যোদ্ধার সংহারসাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া যখন কৌরব সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি সুরক্ষিত থাকিলেই পাণ্ডব সৈন্যের উচ্ছেদসাধন অবশ্যম্ভাবী হইবে। কৌরব সৈন্যে ভীষ্মের পরই দ্রোণের স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকায় দুর্য্যোধন উক্ত ১১ শ্লোকে আচার্য্যকে অনুরোধ করিতেছেন, অন্যান্য সেনানায়ক-

গণ সহ তিনি যেন প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতে যত্নবান থাকেন। দুর্য্যোধনের এই উক্তিও যে তাঁহার পাণ্ডব ভীতিরই পরিচায়ক, তাহা সম্ভবতঃ সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

পাণ্ডব-সৈন্যদর্শনে দুর্য্যোধন ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, সম্ভবতঃ এই সংবাদ জানিতে পারিয়াই কৌরব সৈন্যের নায়ক প্রবল পরাক্রান্ত ভীষ্মদেব যে তখনই তাহার হর্ষোৎপাদনের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন, পরের শ্লোকে তাহাই বর্ণিত আছে; যথা—

"তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্॥ ১২।

সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনিই সেকালে যুদ্ধারম্ভের ঘোষণা বলিয়া পরিগণিত হইত; কাযেই ভীষ্ম তদ্রূপ করিয়া কৌরব সৈন্যদলকে যে পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিবারই আদেশ দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব ভীষ্মের এই আচরণ হইতে অবাধেই অনুমিত হইতে পারে যে, কৌরবেরাই পাণ্ডবগণকে প্রথম আক্রমণ করে, এবং তৎপর পাণ্ডবগণ আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়।

ভীষ্মের শঙ্খধ্বনির পর কৌরব-পক্ষের রণবাদ্য তুমুল রবে ধ্বনিত হইতে থাকে। কৌরবগণ এইরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডব পক্ষের প্রধান ব্যক্তিরাও যে যথাক্রমে শঙ্খধ্বনি করিয়া প্রতিপক্ষের আহ্বান গ্রহণ করিয়াছিলেন ১৪-১৮ শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল শ্লোকে পাণ্ডব পক্ষের শঙ্খধ্বনির

ক্রম যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য। বীরবর অর্জ্জুন পাণ্ডব পক্ষের প্রধান নায়ক হইলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণই তাহার সারথ্যগ্রহণপূর্ব্বক প্রকৃত নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাই সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া কৌরব-গণের শঙ্খধ্বনির প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যুদ্ধোদ্যম অনুমোদন করিলেন। অর্জ্জুন যদি অগ্রে শঙ্খধ্বনি করিতেন, তাহা হইলে উহা তাঁহার আত্মাভিমানেরই পরিচায়ক হইত; কিন্তু তিনি তেমন অবিবেচক ছিলেন না। কাযেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খধ্বনি করিয়া যখন যুদ্ধ অনুমোদন করিলেন, তখনই তিনি সানন্দে স্বকীয় দেবদত্ত শঙ্খ ধ্বনিত করিয়াছিলেন ইহার পর যথাক্রমে ভীম, রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অভিমন্যু একে একে শঙ্খনাদ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের-পর মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনই পাণ্ডব পক্ষে প্রধান বীর ছিলেন বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্বেই তিনি শঙ্খধ্বনি করিয়াছেন। এখানেও পাঠক দেখিতেছেন, কৌরব পক্ষে একমাত্র ভীষ্মের এবং পাণ্ডব পক্ষে শ্রীকৃষ্ণাদি আঠার জনের শঙ্খধ্বনির বিষয় সঞ্জয় বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং পাণ্ডব পক্ষ সংখ্যায় কম হইলেও পরাক্রমে যে তাহারাই প্রবলতর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন। অতঃপর ১৯ শ্লোকে সঞ্জয় যাহা বলিয়া-ছেন, তাহাতে তাঁহার এই ইঙ্গিত প্রকটভাবেই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্লোকে সঞ্জয় বলিতেছেন,—

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯।

—সেই তুমুল শঙ্খধ্বনি নভঃস্থল ও ধরাতল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ও তৎপক্ষীয় বীরবর্গের মর্ম্মস্থান সকল বিদীর্ণ করিয়াছিল। ভীষ্মের শঙ্খধ্বনিতে যে পাণ্ডব-পক্ষ কোনরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র ইঙ্গিতই সঞ্জয়ের উক্তিতে নাই; পরন্তু পাণ্ডব-পক্ষের শঙ্খধ্বনি শ্রবণে কৌরবগণ যে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, সঞ্জয় তাহা উচ্চকণ্ঠেই জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা হইতেও কৌরবগণের পাণ্ডবভীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। অসজ্জনেরা মুখে যতই গর্ব্ব প্রকাশ করুক না কেন, কার্য্যকালে তাহারা যখন সজ্জনের সম্মুখীন হয়, তখন তাহাদিগকে সত্য সত্যই সঙ্কুচিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয়, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সম্মিলিত হওয়ার ফলে ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের শৌর্য্য-বীর্য্য সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং অধর্ম্মাশ্রয়ী কৌরবগণ আতঙ্কান্বিত হওয়াতে তাহাদের উৎসাহ ও উদ্যম হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কারণেই অধিকতর বলসম্পন্ন হইয়াও পাণ্ডব পক্ষের শঙ্খধ্বনি তাহাদিগকে বিকম্পিত করিয়া থাকিবে।

কৌরব-পক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পরই যে পাণ্ডবগণের পক্ষে অর্জ্জুন স্বয়ং অগ্রে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, অতঃপর সঞ্জয় তাহা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণন করিতেছেন,—

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ॥২০॥

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥

—মহারাজ! কপিধ্বজ ধনঞ্জয় দেখিলেন, আপনার পুত্রগণ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে; তখন কৌরব-পক্ষ শস্ত্রপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে ধনঞ্জয় স্বকীয় গাণ্ডীব ধনু উত্তোলন করিয়া সারথি হৃষীকেশকে কহিলেন, হে অচ্যুত! আমার রথ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে নিয়া স্থাপন কর। কৌরবগণই যে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল, এবং তৎপর পাণ্ডব-পক্ষে অর্জ্জুন উহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হন, সঞ্জয়ের উল্লিখিত উক্তিতে তাহা সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত আছে। স্বার্থের জন্য অপরকে আক্রমণ ক্ষাত্র-ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে; ক্ষতাৎ ত্রায়তে ইতি ক্ষত্রঃ—অনিষ্ট হইতে উদ্ধার করার জন্যই ক্ষত্রিয় নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কাযেই কৌরব পক্ষের প্রথম আক্রমণ ক্ষাত্রধর্ম্মোচিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; দুর্লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা পাণ্ডব-গণের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অর্জ্জুন ঐরূপ আক্রমণ হইতে পাণ্ডব-পক্ষকে রক্ষা করিবার জন্যই যুদ্ধারম্ভ করেন; সুতরাং তাঁহার কার্য্য যে সম্পূর্ণ স্বধর্ম্মোচিত, তাহা অবাধেই বলা যাইতে পারে। কেবল ইহাই পাণ্ডবগণের ক্ষত্রিয়োচিত আচরণের পরিচায়ক নহে, অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবেরা শান্তিস্থাপনের জন্য যেরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, একালে তাহার তুলনা মিলে না। দুর্য্যোধন যখন কিছুতেই তাহাদিগকে রাজ্যের অংশপ্রদানে সম্মত হইল

না, তখন অগত্যা সর্ব্বশেষে তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতার জন্য অতি অকিঞ্চিৎকর পাঁচখানা গ্রাম মাত্র পাইয়াও জ্ঞাতিবিরোধ হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ম্মতি কৌরবপতি বিনা যুদ্ধে তাঁহাদিগকে সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমিও প্রদান করিতে অসম্মত হওয়াতে আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়াই অবশেষে পাণ্ডবগণ যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হ'ন। সুতরাং পাণ্ডবগণ যে ধর্ম্মযুদ্ধেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় উঠিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান যাঁহাদের উপদেষ্টা ও পরিচালক, তাঁহারা অধর্ম্মের পথে পদার্পণ করিবেন, ইহা কল্পনায় আনাও অন্যায়।

অর্জ্জুন সারথিকে উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে স্বকীয় রথ লইয়া যাইতে বলিয়া হৃষীকেশকে কি কহিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধু্কামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২৩।
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩।

—অর্জ্জুন সারথি শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—"হে নারায়ণ! কৌরব পক্ষে যাহারা যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অবস্থিত আছে, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ বীরের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, উহাদিগকে দেখিয়া যে পর্য্যন্ত আমি তাহা নির্ণয় না করি, এবং এই যুদ্ধে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের হিতকামনায় যাহারা আমাদের

সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদিগকে উত্তমরূপে দেখিয়া না লই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমার রথ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে নিয়া রাখিবার ব্যবস্থা কর।" অর্জ্জুনের এই উক্তিতে পাঠক দেখিতেছেন, তিনি বিপক্ষের প্রতি শরবর্ষণের নিমিত্ত ধনু উত্তোলন করিয়াও বাণপ্রয়োগের পূর্ব্বে বিপক্ষের প্রধান বীরবর্গ কে কোথায় কি ভাবে অবস্থিত আছে, তাহা ভালরূপে দেখিয়া লওয়াই প্রথম কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন। যুদ্ধের নীতিও ইহাই; প্রতিপক্ষের রণকৌশল ভালরূপে বুঝিতে না পারিলে যুদ্ধে সুবিধা করা সম্ভবপর হয় না। এজন্যই অর্জ্জুন কৃতোদ্যম হইয়াও অপর পক্ষের বিষয় ভালরূপ বুঝিবার নিমিত্ত তাঁহার রথ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে লইয়া যাইবার জন্য সারথিকে অনুরোধ করিয়াছেন। কৌরবপক্ষের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বীর অর্জ্জুন নিজে তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন; কাযেই তাহারা শত্রুব্যূহের কোন্ অংশে কে অবস্থিত আছেন, তিনি তাহা দেখিয়া লইতে চাহেন; তার পর, যেসকল বীরপুরুষ দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেমন করিয়া তাহাদের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখার জন্যও বিপক্ষের সৈন্য সমাবেশ ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা তাহার প্রয়োজন। ২৩ শ্লোকে অর্জ্জুন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অপর পক্ষের প্রতি তাঁহার অত্যধিক আক্রোশেরই পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং অর্জ্জুন যে ইহার পর কৌরবগণকে দেখিয়াই যুদ্ধবিমুখ

হইবেন, তাহার কোন চিহ্নই এপর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হইতেছে না। গীতার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে হইলে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক। অতঃপর সঞ্জয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে অর্জ্জুনের এই উক্তি চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, অকস্মাৎ অর্জ্জুনের ভাবান্তর কোন অভাবনীয় কারণ ব্যতীত স্বভাবের গতিতে কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। প্রতিপক্ষের সংহার-সাধনে যিনি এরূপ উৎসাহ ও উত্তম সহকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিয়াই মমতার মোহে তিনি যুদ্ধবিমুখ হইবেন, সাধারণ নিয়মে ইহা কল্পনায় আনাও সম্ভবপর নহে! অথচ তদ্রূপ অঘটন সত্যসত্যই সংঘটিত হইয়াছিল। কেন তাহা হইল, গ্রন্থারম্ভে পাঠক অর্জ্জুনের অবসাদ-শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা বোধ হয় বুঝিবার অবকাশ পাইয়াছেন।

অর্জ্জুনের উক্ত অনুরোধ অনুসারে সারথিশিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে তাঁহার রথ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে নিয়া রাখিলেন, এবং রথ তথায় লইয়া গিয়া অর্জ্জুনকে কি বলিলেন ২৪—২৫ শ্লোকে সঞ্জয় তাহা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, —

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪।
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫।

—জিতনিদ্র অর্থাৎ মোহমুক্ত অর্জ্জুন ইন্দ্রিয়গণের অধিনায়ক

ভগবানকে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরোধ করিলে তিনি উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে ভীষ্ম, দ্রোণ ও অপর সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মুখভাগে রথ লইয়া গিয়া তাহাকে কহিলেন, হে পৃথানন্দন! যুদ্ধার্থ সমবেত এই কৌরবগণকে উত্তমরূপে দেখিয়া লও। এখানে অর্জ্জুন গুড়াকেশ নামে অভিহিত হইয়াছেন; নিদ্রা বা মোহকে যিনি জয় করিতে পারেন, অর্থাৎ মোহ যাহাকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ নহে, তিনিই গুড়াকেশ-পদবাচ্য। সুতরাং এই পদ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মমতার মোহ তখন পর্য্যন্ত অর্জ্জুনকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণ হৃষীকেশ নামে কথিত হওয়াতে, পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার সঙ্কেতমাত্রই অর্জ্জুন যে মমতার মোহে অভিভূত হইয়া পড়িবেন, তাহারই ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। 'হৃষীক' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়বর্গ। সেই ইন্দ্রিয় সমূহের যিনি অধীশ্বর, অর্থাৎ যাঁহার প্রেরণায় ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়াশীল হয়, তিনিই "হৃষীকেশ' নামে অভিহিত হ'ন। মায়া বা মমতার প্রভাব ইন্দ্রিয়ের উপরই প্রসৃত হইয়া থাকে; সুতরাং ইন্দ্রিয়াধীশের ইঙ্গিতমাত্র যে অর্জ্জুন মোহাভিভূত হইয়া পড়িবেন, ইহা অবশ্যই অস্বাভাবিক নহে। এজন্যই সম্ভবতঃ সঞ্জয় এই শ্লোকে 'গুড়াকেশ' ও 'হৃষীকেশ' পদপ্রয়োগ করিয়া পরবর্ত্তী ব্যাপারের আভাস দিয়াছেন। সারথি উভয় সৈন্যের মধ্যে যে ভাবে রথ নিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ কার্য্য কুশলতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; কারণ সেই রথে

উপবিষ্ট থাকিয়া অর্জ্জুন যে কেবল ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকেই সম্মুখে দেখিয়াছিলেন, তাহা নহে; কৌরব পক্ষের অপর যে সকল নৃপতিবর্গ যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকেও তিনি সম্মুখে অবস্থিতের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সাধারণ সারথির পক্ষে এভাবে রথ স্থাপন কখনও সম্ভবপর নহে। রথ লইয়া গিয়া ভগবান অর্জ্জুনকে সামান্য একটী কথামাত্র বলিয়াছিলেন,— "পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি"। —পার্থ! এই সমবেত কৌরবগণকে দেখিয়া লও। এই সরল ও সাধারণ ভগবদুক্তির মধ্যে এমন কোন কিছুই নাই, যাহা হইতে অর্জ্জুনের পরবর্ত্তী চিত্তবিভ্রমের কারণ অনুমাত্রও অনুমিত হইতে পারে। অর্জ্জুন কৌরব পক্ষকে দেখিবার জন্যই রথ উভয় সৈন্যের মধ্যে লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। সারথি শ্রীকৃষ্ণও তদনুসারে রথ তথায় নিয়া কৌরবগণকে দেখাইয়া দিলেন মাত্র। ইহাতে চিন্তা করিবার কি আছে! অথচ এই সামান্য কথাতেই পলকে প্রলয় সংঘটিত হইয়া গেল! কেমন করিয়া কি হইল, অর্জ্জুনের অবসাদশীর্ষক প্রবন্ধে তাহা বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন কৌরবদিগকে দেখাইয়া দিলেন অমনি অর্জ্জুন উভয় সৈন্যদলের মধ্যে পিতৃস্থানীয় পিতৃব্যগণ, পিতামহ সকল, আচার্য্যগণ, মাতুলসমূহ, ভ্রাতৃবর্গ, পুত্রগণ, পৌত্রসমস্ত, সখাসকল, শ্বশুরসমূহ ও সুহৃদ্‌বর্গকে দেখিতে পাইলেন, ২৬ শ্লোকে সঞ্জয় ইহাই কহিয়াছেন। এখানে এই

কথাই বিশেষভাবে চিন্তনীয় যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উভয় পক্ষে কাহারা যোগদান করিয়াছিল, এবং যুদ্ধ-ব্যাপৃত ব্যক্তিবর্গের সহিত অর্জ্জুনের সম্বন্ধ কি, তাহা যে অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে জানিতেন না, এমন কথা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারেন না। উভয় পক্ষের বলাবল উত্তমরূপে বুঝিয়া শুনিয়াই অর্জ্জুন এই মহাসমর আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ধনু উত্তোলন করিয়া কৌরবগণের বিনাশ-সাধনার্থ বাণবর্ষণে উদ্যত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন অঙ্গুলি সঙ্কেতে কৌরবদিগকে দেখাইয়া দিলেন, অমনি অর্জ্জুন উভয় পক্ষের সৈন্যদল মধ্যে স্বজনগণকে দেখিতে পাইলেন, একথা বলিয়া সঞ্জয় অর্জ্জুনের চিত্তে যে বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন। সেই বিপ্লবের বিষয় পরবর্ত্তী শ্লোকে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত আছে,—

> "তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
> কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

—কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন সমস্ত বন্ধুদিগকে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিয়া তাহাদের প্রতি অত্যধিক কৃপার বশে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং সমরে ইহাদের অনেকেই নিহত বা আহত হইবে ভাবিয়া অতিশয় বিষণ্ণভাবে সারথি শ্রীকৃষ্ণকে পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে বর্ণিত কথাগুলি বলিলেন। যে স্বজন-বর্গকে অর্জ্জুন স্বহস্তে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতেই তাহাদের প্রতি তিনি

যৎপরোনাস্তি কৃপার অধীন হইয়া পড়িলেন, ঐন্দ্রজালিকের অভিনয় অপেক্ষাও ইহা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক নহে কি? অর্জ্জুনের এইরূপ অত্যদ্ভুত পরিবর্ত্তনের নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ ছিল; তাহা না হইলে, সেকালের অদ্বিতীয় বীর শত্রুবর্গের শিরশ্ছেদ করিবার নিমিত্ত ধনুর্ব্বাণ উত্তোলন করিয়া অমনি তাহাদের প্রতি ঐকান্তিক করুণায় একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িবেন কেন, তাহা সত্যসত্যই সাধারণের বোধগম্য নহে! ক্ষণমাত্র পূর্ব্বেও অর্জ্জুনের চিত্তে এরূপ পরম কৃপার কিছুমাত্র আভাসও পাওয়া যায় নাই। অবশ্যই যুদ্ধে যে সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবে, তাহা স্থিরভাবে ভাবিলে এইরূপ করুণার উদ্রেক অসম্ভব হয় না; কিন্তু অর্জ্জুন চতুর্দ্দশ বৎসর কাল সাধ্য-সাধনা করিয়া যে সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার ফলাফল যে তিনি পূর্ব্বে একবারও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক মনে করেন নাই, এতদপেক্ষা উদ্ভট কল্পনা আর কিছু হইতে পারে কিনা, জানি না! কাযেই সমরের পরিণাম চিন্তা করিয়া অর্জ্জুন এইরূপ কৃপাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, এরূপ অনুমান কোনরূপেই সমর্থনযোগ্য নহে। অর্জ্জুনের এই কৃপাও সাধারণ নহে, 'পরয়া' অর্থাৎ নিরতিশয় কৃপা বলিয়া ইহা বর্ণিত হইয়াছে, অকস্মাৎ এমন কৃপার আবির্ভাব যে আরও বিস্ময়াবহ, তাহা বলাই বাহুল্য। তার পর, এই কৃপার ফলে অর্জ্জুন এমন বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে বর্ণিত তাঁহার উক্তি পাঠ করিলে সত্য-

সত্যই স্তম্ভিত হইতে হয়! কাজেই এই অভাবনীয় ব্যাপারের মূলে ভগবদিচ্ছায় প্রসূত বিষ্ণুমায়ার প্রচণ্ড প্রভাব বিদ্যমান ছিল বলিয়া অর্জ্জুনের অবসাদ-শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ তাহা কখনই উপেক্ষায় উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। আলোচ্য শ্লোকে প্রযুক্ত 'আবিষ্ট' পদও বিশেষার্থ-জ্ঞাপক বলিয়াই মনে হয়। বাহিরের কোন শক্তিদ্বারা যখন কেহ একবারে অভিভূত হইয়া ভিন্ন ভাব ধারণ করে, সাধারণতঃ তাহাকেই তখন 'আবিষ্ট' বলা হইয়া থাকে; ভূতাবিষ্ট বলিলে যেমন ভূতের প্রভাবে ভাবান্তর-প্রাপ্তি বুঝায়, এখানেও সম্ভবতঃ সেই ভাবেই 'কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ' বলা হইয়া থাকিবে। এরূপ অনুমান অসঙ্গত না হইলে, ভগবন্মায়ায় প্রসূত করুণার প্রভাবে অর্জ্জুন যে একবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেকথা স্বীকার করিতেই হইবে। এখানে 'কৃপা' করুণা অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহারাজ এই শ্লোকে প্রযুক্ত 'কৌন্তেয়' পদের সার্থকতা দেখাইবার জন্য যাহা বলিয়াছেন তাহার ভাব এই যে, অর্জ্জুন এরূপ স্ত্রীজনোচিত কৃপার বশীভূত হইয়া পড়াতেই সঞ্জয় তাঁহাকে তাঁহার মাতৃ-সম্বন্ধ ধরিয়া 'কৌন্তেয়' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এরূপ অনুমান একবারে অস্বাভাবিক না হইলেও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে যে ইহা একান্তই অযৌক্তিক, তাহা বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক। কারণ সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রথমাবধিই বলিয়া আসিয়াছেন,

যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী। তার পর, তিনি সমস্ত তত্ত্বই উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। সুতরাং অর্জ্জুনের এরূপ ব্যাপার যে ভগবন্মায়ায়ই ঘটিয়াছিল, তাহা জানিয়াও তিনি অর্জ্জুনকে বিদ্রূপ করিবেন, এরূপ কথনই সম্ভবপর নহে। এতদ্ব্যতীত সরস্বতী মহারাজ "কৃপয়া পরয়া" কথাকে "কৃপয়া অপরয়া" রূপে বিশ্লেষণ করিয়া যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা আরও বিস্ময়াবহ। তিনি বলেন, অর্জ্জুন স্বপক্ষের প্রতি কৃপা-পরবশতো পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন; এখন অপর পক্ষ কৌরবগণের জন্যও তাঁহার চিত্ত করুণার্দ্র হইয়া পড়িল। এজন্য তিনি উভয় পক্ষের কল্যাণকামনায় যুদ্ধ না করাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন। অর্জ্জুন যদি এইরূপ কৃপার অধীন হইয়াই যুদ্ধবিমুখ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে নিজ পক্ষের প্রতি তিনি যখন পূর্ব্ব হইতেই কৃপাযুক্ত ছিলেন, তখন তাহাদিগকে লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিলেন কেন? তাঁহার পক্ষীয় বীরেরা কেহই যে এই যুদ্ধে নিহত বা আহত হইবে না, এমন অসম্ভব কল্পনা তিনি কথনও করিতে পারেন কি? কাজেই সরস্বতী মহারাজের এই ব্যাখ্যাও সমর্থনযোগ্য নহে। গীতার প্রত্যেকটী পদেরই যে সার্থকতা আছে, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না; কিন্তু এভাবে সার্থকতা-প্রদর্শনের প্রয়াস চিন্তাশীলতার পরিচায়ক নহে। 'বিষীদন্' কথার ব্যাখ্যায়ও সরস্বতী মহারাজ এইরূপ কল্পনারই আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি বলেন, এইরূপ বিষাদের ফলে অর্জ্জুন

গদগদকণ্ঠ ও অশ্রুসিক্তনেত্র হইয়াছিলেন। বিষাদের ফলে তদ্রূপ হওয়া অসম্ভব না হইলেও, অর্জ্জুন যে গদ্গদ্‌অশ্রুনেত্রে ও আবেগকম্পিত-কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে পরবর্ত্তী কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহার কোন পরিচয়ই গীতায় পাওয়া যায় না।

অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত স্বজনবর্গকে দেখিয়া অর্জ্জুনের শরীর ও মনে কিরূপ বিষম বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছিল, এবং স্বজনবধে পরাঙ্মুখ হইয়া তিনি এই যুদ্ধকে পাপজনক বলিয়া বর্ণনপূর্ব্বক কৌরবগণকে বধ করা অপেক্ষা তাহারা যদি তাঁহাকে অস্ত্রহীন অবস্থায় দেখিয়াও হত্যা করে, তবে তাহাও যে তিনি শ্রেয়স্কর মনে করিবেন, ২৮—৪৫ শ্লোকে অর্জ্জুন তাহাই বর্ণন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অর্জ্জুনের অবসাদ-শীর্ষক প্রসঙ্গে ২৮—৩৬ শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হওয়াতে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল না; পাঠক যথাস্থানে তাহা দেখিয়া লইতে পারেন। কৃপা অর্থাৎ করুণার প্রভাবে অর্জ্জুনের শরীর বিকম্পিত ও চর্ম্ম দগ্ধীভূত হইয়াছিল, এবং তাঁহার হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছিল ও তিনি রথের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। স্বাভাবিক করুণার ফল কখনই এমন ভয়ঙ্কর হইতে পারে না; কাযেই অর্জ্জুনের এই দুরবস্থা দ্বারাও প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, ভগবদিচ্ছায় বৈষ্ণবী মায়া তাঁহাকে অস্বাভাবিকরূপেই অভিভূত করিয়াছিল। এখানে পাঠক ইহাও দেখিতেছেন, অর্জ্জুন স্বজনবধের আশঙ্কায়ই এইরূপ কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই তিনি এসকল

শ্লোকে স্বজনবর্গের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

যুদ্ধ হইলে অর্জ্জুনের আত্মীয়-স্বজনবর্গের অধিকাংশই হতাহত হইতে পারেন ভাবিয়া অর্জ্জুন এরূপ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অবশেষে তিনি একথা বলিতেও কুণ্ঠিত হ'ন নাই,—

এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতি স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫।

—কৌরবগণ যদি আমাকে বধ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলেও আমি ইহাদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। হে জনার্দ্দন! সামান্য পার্থিব রাজ্যতো অতি তুচ্ছ বিষয়, সমগ্র ত্রৈলোক্য-রাজ্যের নিমিত্তও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করিয়া আমরা কখনই প্রীতি লাভ করিতে পারি না। এরূপ উক্তি যে মমতাজনিত মোহের পরাকাষ্ঠারই পরিচায়ক, তাহা সম্ভবতঃ সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

অর্জ্জুন বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, স্বজনপ্রীতির কথা শুনিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন; কিন্তু তাহার কোন আভাস না পাইয়া অতঃপর তিনি আততায়ি-বধেও যে পাপ হইবে, তাহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন আকর্ষণে যত্নবান হইয়াছেন। তাই ৩৬ শ্লোকে তিনি বলিতেছেন,—

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬।

—কৌরবগণ আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে আততায়ী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে সত্য, তথাপি ইহাদিগকে বধ করিলে আমরা নিশ্চয়ই পাতকগ্রস্ত হইব; কাযেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে সবান্ধবে হত্যা করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে; হে মাধব! স্বজনদিগকে বধ করিয়া আমরা সুখী হইব কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন যে, কৌরবগণ যখন তোমাদের আততায়ী বা শত্রু, তখন ইহাদিগকে বধ করিলে শাস্ত্রানুসারে কোন পাপই হইবে না, সেই আশঙ্কায়ই অর্জ্জুন এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন; কিন্তু এখানেও তাঁহার স্বজনপ্রীতির কথাই শেষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং স্বজনের মমতায়ই যে অর্জ্জুন আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর কোথায়? ইহাই বিষ্ণুমায়া, এবং এতৎপ্রভাবেই সংসারচক্র পরিচালিত হইয়া থাকে।

অর্থশাস্ত্রে আততায়ীর সংজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে নিরূপিত আছে,—

"অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥"

—যে অগ্নি বা বিষ দ্বারা হত্যা করিতে চেষ্টা করে, শস্ত্র ধারণ করিয়া নিকটে আসে, ধন কাড়িয়া নিয়া যায়, ক্ষেত্র ও স্ত্রী অপহরণ করিয়া থাকে, এই প্রকার ছয় ব্যক্তিই 'আততায়ী' সংজ্ঞার অন্তর্ভূত। এই আততায়ীদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,—

"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষোহন্তুর্ভবতি কশ্চন ॥"

—আততায়ী নিকটে আসিলেই কোনরূপ বিচার না করিয়া তাহাকে বধ করিবে; আততায়িবধে হত্যাকারীর কোনই দোষ হয় না। এই শাস্ত্রানুশাসন অনুসারে কৌরবদিগকে বধ করিলে অর্জ্জুনের কোনই অপরাধ হয় না; কারণ উপরে আততায়ীর যে ছয়প্রকার লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা পাণ্ডবগণের প্রতি উহার সকলপ্রকার অত্যাচারই করিয়াছে। কাযেই শ্রীকৃষ্ণ যদি এই যুক্তি দেখাইয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে চাহেন, তাহারই প্রতিবাদকল্পে অর্জ্জুন এখানে বলিতেছেন,—নারায়ণ! কৌরবগণ আমাদের আততায়ী হইলেও, উহাদিগকে বধ করিলে হত্যাজনিত পাপ আমাদিগকে স্পর্শ করিবেই। কারণ আততায়ি-বধে যে পাপ হয় না, তাহা অর্থশাস্ত্রের নির্দ্দেশমাত্র; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে জীবহিংসামাত্রই পাপজনক। শ্রুতি বলিতেছেন,—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি।" —কোন প্রাণীকেই কখনও হিংসা করিবে না। ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ পালন করাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য; সুতরাং অর্থশাস্ত্রে আততায়িবধের নির্দ্দেশ থাকিলেও ধর্ম্মশাস্ত্রের শাসনে উহাতে পাতক অবশ্যম্ভাবী। এই কারণেও ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে হত্যা করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীমৎ আনন্দগিরি এই শ্লোকের

আর একরূপ ব্যাখ্যাও করিয়াছেন, তন্মতে শ্লোকের প্রথম চরণের অন্বয় হইবে এইরূপ—"এতান্ হত্বা আততায়িনঃ অস্মান্ পাপং এব আশ্রয়েৎ"। —ইহাদিগকে হত্যা করিলে আমরা উহাদের আততায়ী বলিয়া পরিগণিত হইব, এবং তৎফলে যেমন আমাদিগের হত্যাজনিত পাপ হইবে, তেমন উহাদের কৃত পাপও আমাদিগকে স্পর্শ করিবে। এরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গের অনুরূপ বলিয়া অনুমিত হয় না; সুধী পাঠক আপন মনেই ইহার সারবত্তা ভাবিয়া দেখিবেন।

অতঃপর ৩৭—৪৩ শ্লোকে অর্জ্জুন যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—লোভজনিত চিত্তবিকৃতি নিবন্ধন যদিও কৌরবেরা কুলক্ষয়ের দোষ, এবং মিত্রদ্রোহের পাতক দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয়ের দোষ উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াও তদ্রূপ পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিব না কেন? কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, এবং ধর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হইলে অধর্ম্ম দ্বারা সেই কুল অভিভূত হইয়া পড়ে। হে কৃষ্ণ! কুল অধর্ম্ম দ্বারা অভিভূত হইলে সেই কুলস্থিত রমণীগণের চরিত্রহানি ঘটে, এবং তৎফলে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। এইরূপ সঙ্করোৎপত্তি কুলনাশকারিগণের ও তৎকুলস্থিত সকল ব্যক্তির নরকবাসের কারণ হইয়া থাকে, এবং পিণ্ড ও উদকদান-ক্রিয়া বিলুপ্ত হওয়াতে তাহাদের পিতৃপুরুষগণও নরকে নিপতিত হয়। কুলধ্বংসকারিগণের

এইরূপ বর্ণসঙ্করকারক দোষের ফলে শাশ্বত কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায়। যে সকল মানবের কুলধর্ম্ম এইরূপে বিনষ্ট হয়, গুরুজনমুখে শুনিয়াছি, তাহারা চিরতরে নরকেই বাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

এখানে অর্জ্জুনের উক্তি হইতে ইহাই বুঝা গিয়া থাকে যে, পূর্ব্ব শ্লোকে তিনি আততায়িবধে পাপ হইবে বলিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাও অনুমোদন না করায় অতঃপর তিনি কুলক্ষয়জনিত গুরুতর অনিষ্টের উল্লেখ করিয়া যুদ্ধের অকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদনে যত্নবান হইয়াছেন। যুদ্ধ করিলে কুলক্ষয় যখন অবশ্যম্ভাবী, এবং ঐরূপ কুলক্ষয়ের ফলে পিতৃপুরুষগণের নরকে পতিত হওয়া সর্ব্বথা সম্ভবপর ও কুলক্ষয়কারীর চিরতরে নরকবাস সুনিশ্চিত, তখন এই কুলক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই তিনি একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন।

অর্জ্জুনের এইরূপ যুক্তি অশাস্ত্রীয় বা অসঙ্গত না হইলেও, কুলক্ষয়জনিত পাপাশঙ্কাই যে তাঁহার যুদ্ধবিমুখতার প্রধান কারণ নহে, এবং স্বজনের মমতায় মুগ্ধ হইয়াই যে তিনি যুদ্ধত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন, "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" এই উক্তি হইতে তাহা অসংশয়িতরূপেই অনুমিত হইতে পারে; কাযেই একথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, কেবল যুদ্ধত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের সমর্থনলাভের নিমিত্তই তিনি মৌখিকভাবেই কুলক্ষয়জনিত পাপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মৌখিকভাবে বলিতেছি এই জন্য—অর্জ্জুন যে

কুলক্ষয় ও পিণ্ডোদক-ক্রিয়ার বিলোপ নিবন্ধন পিতৃপুরুষগণের নরকে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ অর্জ্জুন এরূপ নির্ব্বোধ কখনও ছিলেন না যে তিনি মনে করিতে পারেন, কৌরব ও পাণ্ডবগণ সকলেই এই যুদ্ধে মৃত্যুমুখে নিশ্চয়ই নিপতিত হইবে। যে পক্ষই জয়লাভ করুক, কুরুবংশের অন্ততঃ কতক লোক পরিণামে জীবিত থাকিবেই; সুতরাং কুলক্ষয় ও পিণ্ডলোপের কল্পনা একান্তই অমূলক। ৪৪ শ্লোকে অর্জ্জুন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কুলক্ষয়জনিত মহৎ পাপেব উল্লেখ থাকিলেও, স্বজনবধই যে তাঁহাব এই মর্ম্মবেদনার মূলীভূত, চিন্তাশীল পাঠক স্থিরচিত্তে ঐ শ্লোক পড়িয়া দেখিলেই তাহা অবধারণে সমর্থ হইবেন। তথায় অর্জ্জুন বলিয়াছেন, রাজ্য ও সুখেব লোভে স্বজনবধে উদ্যত হইয়া তাঁহারা অতি গুরুতর পাপাচরণেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন; যথা—

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪।

অর্জ্জুন নিজে জীবিত থাকিলেও যে কুলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না, এবং পিতৃপুরুষগণেরও পিণ্ডলোপের সম্ভাবনা নাই, মমতার মোহে অর্জ্জুন তাহা একবার ভাবিয়া দেখারও অবকাশ পান নাই। তাই তিনি কুলরক্ষার অজুহাতে আত্মত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত না হইয়া বলিতেছেন,—

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫।

—আমি কৌরবগণের আক্রমণ প্রতিরোধ না করিয়া অস্ত্রশস্ত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান করিলেও, শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ যদি আমাকে হত্যা করে, তবে তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর কল্যাণজনকই হইবে।

এখানে পাঠক দেখিতেছেন, অর্জ্জুন স্বজনবধকেই ভয়ঙ্কর পাপজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন; প্রাণিহত্যাজনিত পাতকের জন্য তিনি যে কোনরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহার কোন আভাসই এসকল উক্তিতে পরিলক্ষিত হয় না। যুদ্ধ হইলে অর্জ্জুনের স্বজনবর্গ ব্যতীত আরও যে কত লক্ষ লক্ষ লোক এবং হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি জন্তু হতাহত হইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই; সেই সকল হতাহতের মধ্যে অর্জ্জুনের স্বজনের সংখ্যা যে নিতান্ত নগণ্য হইবে, তাহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। কারণ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র ও তাহাদের তনয়গণ এবং উভয় পক্ষস্থিত পিতামহ, পিতৃব্য, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সম্বন্ধী প্রভৃতিই কেবল পাণ্ডবগণের স্বজন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে; অর্জ্জুনও ৩৩।৩৪ শ্লোকে ইহাদিগকে হত্যা করার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। এ অবস্থায় অর্জ্জুন একমাত্র সেই অত্যল্প সংখ্যক স্বজনবর্গের বধাশঙ্কায়ই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে চাহিয়া যে নিতান্ত প্রাকৃত জনের ন্যায় মমতামুগ্ধতারই পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বুঝাইয়া বলা অনাবশ্যক। অর্জ্জুন ২৮—৪৪ শ্লোকের মধ্যে চারিবার এই স্বজনের কথাই বলিয়াছেন, এবং বিশেষভাবে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ

করার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং স্বজনের মমতায়ই যে তিনি যুদ্ধত্যাগ চাহিতেছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনই কারণ নাই। স্বজনবধের চিন্তায় অধীর না হইয়া অর্জ্জুন যদি প্রাণিহিংসার ভয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে চাহিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যাইত।

পূর্ব্বকালের যুদ্ধনীতি অনুসারে অপ্রতিরোধী ও অস্ত্রহীন ব্যক্তির প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগ একান্তই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল; কিন্তু যাহারা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত দুর্নীতি অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইত না, তাহারা নিরস্ত্র ব্যক্তির প্রতিও অস্ত্রপ্রয়োগ করিত। পাপমতি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনকে হত্যা করিতে কখনই ইতস্ততঃ করিবে না, শ্রীকৃষ্ণ একথা বলিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিতে চাহিতে পারেন, ইহা ভাবিয়াই সম্ভবতঃ অর্জ্জুন বলিয়াছেন, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের হস্তে নিহত হওয়াও তিনি শ্রেয়স্কর মনে করেন। অর্জ্জুনের এরূপ আচরণ নিতান্ত বীরজন-বিগর্হিত বলিয়াই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন,—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।"—হে বীরচূড়ামণি পৃথাপুত্র! তুমি এরূপ ক্লীবত্বের পরিচয় দিয়া স্বকীয় গৌরব নষ্ট করিও না; তোমার ন্যায় মহাবীরের পক্ষে ইহা একান্তই অশোভনীয়।

অর্জ্জুনের এইরূপ মনোভাবের বিষয় বর্ণনা করিয়া অতঃপর প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে সঞ্জয় বলিতেছেন;—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

—সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন সারথি শ্রীকৃষ্ণকে উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যে ধনুর্ব্বাণ উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিতান্ত শোকাকুলচিত্তে রণক্ষেত্রেই রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। ইতিপূর্ব্বে ২০ শ্লোকে পাঠক দেখিয়াছেন, অর্জ্জুন শত্রুপক্ষের প্রতি শরবর্ষণের নিমিত্ত বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া ধনুর্ব্বাণ উত্তোলন করিয়াছিলেন। সেইভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন যুক্তিই শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ না করাতে অবশেষে তিনি হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

গীতার প্রথম অধ্যায় এভাবেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই অধ্যায় সমগ্র গীতার মুখবন্ধ-স্বরূপ; সুতরাং পাঠক এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিবরণ ধীরভাবে পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারিলে, অতঃপর শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এজন্য প্রথম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা কিছু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এবং বিষয় সহজে বোধগম্য হওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে একই কথার উল্লেখও করিতে হইয়াছে; আশা করি, সুধী পাঠক সেজন্য বিরক্ত হইবেন না।